গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৩১ সংখ্যা ১৯ মার্চ, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

স্বয়ং আদবানিই যখন 'রায়ট'-এর প্রতীক

উপপ্রধানমন্ত্রী আদবানি 'ভারত উদয় যাত্রা'য় বের হয়েছেন ১০ মার্চ কন্যাকুমারিকা থেকে। কোটি কোটি সরকারি টাকা খরচ করে দেশজুড়ে বিজ্ঞাপনের বন্যা বইয়ে দেওয়ার পরেও আদবানিকে বিজেপি'র সুশাসনের প্রচার করতে ভারতযাত্রায় বেরোতে হল কেন? মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা যখন নিদারুণ কষ্টময়, গরিবি ও বেকারি যখন ঘরে ঘরে, তখন বিজ্ঞাপনের ফানুস উড়িয়ে কি সকল মানুষকে ভোলানো যায়? প্রশ্নটা আদবানির ভারতযাত্রার ক্ষেত্রেও ওঠে। বিজেপি'র 'ভারত উদয়' প্রচার করাই যদি লক্ষ্য হয়, তবে আদবানিজীর ভারতযাত্রাতেই বা মানুষকে সেই মিথ্যা বিশ্বাস করানো যাবে কী করে? তাহলে এই ভারতযাত্রার লক্ষ্য কি উন্নয়ন প্রচার, নাকি অন্য কিছু? এখানে আদবানির ১৯৯০ সালের আর এক 'রথযাত্রা'র প্রসঙ্গ এসে যায়। ঐ 'রথযাত্রা'কে বলা হয়েছিল 'রায়টযাত্রা'। যে যে রাজ্য ছুঁয়ে আদবানির 'রথ' গিয়েছিল, সর্বত্রই দাঙ্গার বলি হয়েছিল নিরপরাধ মানুষ, শত শত নিরীহ প্রাণ খুন হয়েছিল।

এবার ভারতযাত্রার আগে আদবানিকে সেই ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিতেই জবাবে তিনি বলেছেন, ওসব অপপ্রচার। গুজরাট বাদ দিলে বাজপেয়ীর শাসনে আর কোন দাঙ্গার ঘটনাই নাকি ঘটেনি এবং তাঁর কথায় গুজরাট দাঙ্গা বাজপেয়ী শাসনের একটি 'কলঙ্ক'। একথা কিন্তু গুজরাটে যখন পরিকল্পিতভাবে পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্যে, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরিচালনায় সংখ্যালঘু নিধন চলছিল, তখন আদবানিরা বলেননি। বরং আগাগোড়া মোদিকে তাঁরা সমর্থন দিয়েছেন এবং বলেছেন গুজরাটের গণহত্যা নিয়ে যা বলা হচ্ছে, সবই অপপ্রচার! সুশাসন-এর প্রবক্তা আদবানিজীকে প্রশ্ন — আপনার কোন্ কথাটা সত্য, সেদিন যা বলেছিলেন, না কি আজ যা বলছেন? অবশ্য এবারও যে তিনি ভণ্ডামিই করছেন, সেটা তাঁর পরের কথাতেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেছেন, ''গোধরার ঘটনা না হলে গুজরাট ঘটত না।'' অথচ, গোধরায় ট্রেনে আগুন কারা দিয়েছিল, পুড়ে মারা যাওয়া মানুষগুলো কারা, সবটাই কিন্তু এখনও রহস্যাবৃত, প্রকৃত সত্য এখনও উদ্‌ঘাটন করা হয়নি। বিজেপি

চারের পাতায় দেখুন

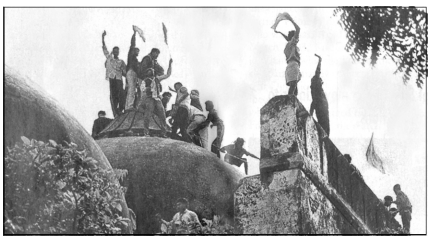

৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রাক মুহূর্ত

পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যা ঃ ডি এস ও-র বিক্ষোভ

এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ইংরেজি প্রশ্নপত্র কঠিন ও ভুলে ভরা হওয়ায় লক্ষ লক্ষ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী চূড়ান্ত সমস্যার সম্মুখীন। এই ঘটনার ফলশ্রুতিতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সমীর মণ্ডল আত্মহত্যা করেছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এআইডিএসও'র কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদে ১১ মার্চ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সামনে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ সংগঠিত করে। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন এআইডিএসও'র কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড আয়সানুল হক। বিক্ষোভ থেকে দাবি তোলা হয় অবিলম্বে সিলেবাস বহির্ভূত এবং ভুলে ভরা প্রশ্নপত্র রচনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে হবে, সমীর মণ্ডলের মৃত্যুর দায়ভার পর্ষদ কর্তৃপক্ষকে স্বীকার করতে হবে এবং ইংরেজি পরীক্ষার খাতা সহজ করে দেখতে হবে। বিক্ষোভ সমাবেশে কঠিন ইংরেজি প্রশ্নপত্রের প্রতিলিপি পোড়ান হয়।

বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব

এস ইউ সি আই-এর ওয়াক আউট

এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ১১ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নিম্নোক্ত মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য স্পিকারের সম্মতি চেয়েছিলেন।

''মাধ্যমিকের ইংরেজি প্রশ্নপত্র ছাত্রদের মানের তুলনায় কঠিন হয়েছে এবং তা ভুলে ভরা। এ নিয়ে ইতিমধ্যেই সর্বত্র প্রশ্ন উঠেছে। গতকাল মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার নবকোলা গ্রামের বাসিন্দা সমীর মণ্ডল (১৮) ইংরেজি পরীক্ষা খারাপ হওয়ার জন্য আত্মঘাতী হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

একটি ছাত্রের আত্মঘাতী হওয়ার মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে পারল পর্ষদের গাফিলতি এবং অযোগ্যতার জন্য। প্রশ্নপত্র কঠিন এবং ভুলে ভরা বিষয়টি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রশ্নপত্র ফাঁস, খাতা হারিয়ে যাওয়া, রেজাল্ট কেলেঙ্কারি সহ পর্ষদের বিভিন্ন ধরনের গাফিলতিতে বহু ছাত্রের শিক্ষাজীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে। অনেক ক্ষেত্রেই আত্মহত্যার মতো দুঃখজনক ঘটনাও ঘটে।

আমাদের দাবি — ''আত্মহননকারী ছাত্রটির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ইংরেজি প্রশ্নপত্র নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে এবং দোষীদের শাস্তি দিতে হবে।

এছাড়াও আমরা দাবি করছি, ছাত্রদের মানের তুলনায় কঠিন ও ভুলে ভরা প্রশ্নপত্রের দায় ছাত্রদের ঘাড়ে চাপানো চলবে না। সহজ করে খাতা দেখতে হবে যাতে কোন ছাত্র ইংরেজি প্রশ্নের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।''

এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপনে অসম্মতিই শুধু নয়, পাঠ করার অনুমতি দিতেও স্পিকার অস্বীকার করায় প্রতিবাদে দেবপ্রসাদ সরকার ওয়াক আউট করেন।

'ইরাক থেকে আমেরিকা হাত ওঠাও'

২০ মার্চ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবসে

বিক্ষোভ জমায়েত ঃ এসপ্ল্যানেড মেট্রো, বেলা ২টা

আলুচাষীর আত্মহত্যা। সি পি এম ও রাজ্য সরকারের ঘৃণ্য মিথ্যাচার

গত ৩ মার্চ বর্ধমান জেলার মেমারি ২নং ব্লকের বিজুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিসকোবা গ্রামের রবীন্দ্রনাথ ঘোষের (৩৮) আলুচাষ ধসা রোগে বিপর্যস্ত হওয়ায়, ঋণের দায়ে তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে ফসলের উপযুক্ত দাম না পাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষই প্রথম আত্মহত্যা করলেন তা নয়, এর আগে ২০০২ সালে কোচবিহার জেলার দিনহাটার করলাচাষী রামেশ্বর বর্মণ করলার উপযুক্ত দাম না পেয়ে ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার হতাশায় আত্মঘাতী হন। বর্ধমানের জামালপুরের আলুচাষী সৈফুদ্দিন চৌধুরী আলুর উপযুক্ত দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আত্মহত্যা করেছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা টাউন থানার বীর ভানুপুর গ্রামের আলুচাষী শিবহরি চৌধুরী (৪৫) ২০০৩ সালের ২৬ মার্চ।

আলুচাষীদের ঋণভারে আত্মহননের ঘটনাকে চাপা দিতে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার অতীতে যেমন নানা আজগুবি কাহিনী বানিয়ে মিথ্যাপ্রচার করেছিল, রবীন্দ্রনাথ ঘোষের ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার, সি পি এম নেতারা এবং সি পি এম-এর মুখপত্র 'গণশক্তি' একইভাবে মিথ্যাপ্রচার করে চলেছে। এবারে তাদের এই মিথ্যাপ্রচার এত নিম্নমানের যে ঋণভার জর্জরিত মৃত চাষী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে তার পরিবারের মর্যাদা নষ্ট করতেও 'গণশক্তি'র রুচিতে এতটুকু বাধেনি। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, যিনি খুবই সংস্কৃতিবান বলে 'এলিট' মহলে এবং 'কর্পোরেট' মহলে প্রশংসিত, তিনিও বললেন, ওই আত্মহত্যার সঙ্গে আলু বা কৃষিজনিত বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই। ওটা বাজে ব্যাপার। সেটা কী আমি বলব না।' (আনন্দবাজার ৬.৩.০৪) তিনি না বললেও তা খোলসা করে প্রকাশ করেছে 'গণশক্তি'। এক

সাতের পাতায় দেখুন

কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা অবশ্যই করা যায়

দিল্লিতে মহিলা কনভেনশনে বিচারপতি রাজিন্দর সাচার

'মহিলা পুলিশ ছাড়াই এবং দিনে রাতে যেকোন সময় অভিযুক্ত মহিলাদের গ্রেপ্তার করা যাবে' এই মর্মে সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি যে রায় দিয়েছে, তার প্রতিবাদে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের দিল্লি শাখার উদ্যোগে ১৩ ফেব্রুয়ারি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মহিলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন দিল্লি হাইকোর্টের পূর্বতন প্রধান বিচারপতি রাজিন্দর সাচার। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও নানা এলাকা থেকে বহু সংখ্যায় মহিলারা এই কনভেনশনে যোগ দেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন এ আই এম এস এস-এর সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী, সাধারণ সম্পাদিকা ডাঃ এইচ জি জয়লক্ষ্মী, এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, অল ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নার্সেস ফেডারেশন-এর সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী জি কে খুরানা এবং এ আই এম এস এস-এর দিল্লি শাখার সম্পাদিকা কমরেড কুসুম সিং। এ আই এম এস এস-এর দিল্লি শাখার সভানেত্রী অধ্যাপিকা সুবোধ শর্মা কনভেনশন পরিচালনা করেন।

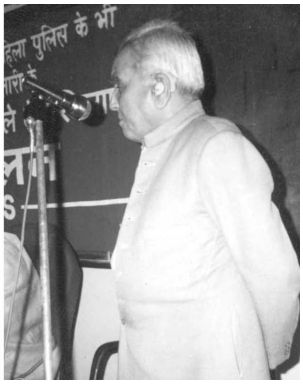

মঞ্চে (বাম দিক থেকে) শ্রীমতী জি কে খুরানা, কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, কমরেড কুসুম সিং, কমরেড ছায়া মুখার্জী, কমরেড এইচ এস জয়লক্ষ্মী ও অধ্যাপিকা সুবোধ শর্মা। (ডাইনে) বিচারপতি রাজিন্দর সাচার

বক্তারা বলেন, মহিলাদের ওপর আক্রমণ, অত্যাচার, হিংসা পূর্বেকার সকল রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছে, ইভটিজিং কুৎসিত রূপ নিয়েছে, নাবালিকা ধর্ষণের মত ভয়াবহ ঘটনা বাড়ছে, খোদ দিল্লির বুকেই নারীদের মর্যাদা লুণ্ঠিত হচ্ছে, অন্যদিকে দাগী সমাজবিরোধীরা শুধু নয়, স্বয়ং পুলিশ কর্মীদের দ্বারাই নারীর ইজ্জৎ লুণ্ঠিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মুম্বই হাইকোর্টের পূর্বতন একটি রায়কে নাকচ করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় অত্যন্ত দুঃখজনক।

বিচারপতি রাজিন্দর সাচার বলেন, কোর্টের এই রায়ের সমালোচনা করতে অনেকে ভয় পাচ্ছেন বলে তিনি শুনেছেন। তাঁর মতে, আইন সম্পর্কে অজ্ঞতাই এর কারণ। কোর্টের কোন রায়ের সমালোচনা তখনই একমাত্র আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়বে যদি এমন দোষারোপ করা হয় যে, ঐ বিচারপতি বা বেঞ্চ উদ্দেশ্যমূলকভাবেই কোন রায় দিয়েছেন। এছাড়া যেকোন রায়েরই সমালোচনা করা যায়, সমাজে ঐ রায়ের ক্ষতিকর প্রভাব বা রায়টির অযৌক্তিকতা দেখিয়ে এমনকী ঐ রায়কে চ্যালেঞ্জ করাও যায়। এটা দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার। সংশ্লিষ্ট রায় বাতিলের দাবিতে এবং নারীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য এ আই এম এস এস যে আন্দোলনের সূচনা করেছে তাতে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি মহিলাদের ও অন্যান্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণের প্রতি আবেদন জানান।

সংগঠকরা জানান যে, সাম্প্রতিক রায়টি পুনর্বিবেচনার জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন জানানো হয়েছে যাতে অভিযুক্ত মহিলাদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে পূর্বেকার বিধিবিধানের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই কেবল নয়, এমন নতুন বিধান যাতে যুক্ত করা হয়, যার দ্বারা ধর্ষণে যুক্ত সমাজবিরোধীদের তো বটেই, 'আইন শৃঙ্খলার যে রক্ষকরা' এই ধরনের জঘন্য কাজে লিপ্ত, তাদেরও দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দেওয়া যায়। আলোচ্য রায়টির বিরুদ্ধে শ্রীমতী রীতু ভার্মা একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যা সর্বসম্মতিক্রমে কনভেনশনে গৃহীত হয়।

প্রস্তাবিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থান পরিবর্তনের দাবিতে

পুরুলিয়ায় গণকনভেনশন

পুরুলিয়া জেলার নেতুড়িয়া থানার জনার্দনডি অঞ্চলের পাঞ্চেৎ পাহাড়ের কোলে ডি ভি সি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ১০০০ মেগাওয়াটের একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আধুনিক যুগে বিদ্যুৎশিল্প সভ্যতার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রতিটি মানুষই এই শিল্পকে স্বাগত জানাতে বাধ্য। কিন্তু প্রস্তাবিত এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নিয়ে এলাকার মানুষের মনে কিছু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, যেগুলি গুরুত্বের দিক থেকে কোন অংশে কম নয়। শুধু এলাকার নয়, ভাবিয়ে তুলেছে জেলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদেরও।

পাঞ্চেৎ পাহাড়ের নীচেই ঝর্ণার জলে সমৃদ্ধ ৫টি বিশাল আকারের জলাশয় খরা পীড়িত পুরুলিয়ার পানীয় জল, সেচের জল এবং মাছ চাষের এক মস্ত বড় সংস্থান। এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তুলতে গিয়ে ৬টি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের তিন হাজার পরিবার উৎখাত হবে তাদের ভিটেমাটি থেকে, ধ্বংস হবে এই সবুজ বনানী এবং জলের উৎসগুলি। এগুলি কোনভাবেই ধ্বংস হতে দেওয়া যায় কি! কারণ এগুলি ধ্বংস হলে প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারাবে; অনিবার্যভাবেই নেমে আসবে নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এছাড়া এব ফলে উর্বর চাষযোগ্য ৬০০০ বিঘা জমি ধ্বংস হবে। সরকার ক্ষতিপূরণের কথা বললেও, তা দিয়ে উৎখাত হওয়া মানুষগুলি হারানো সম্পদ এবং নিশ্চিত রুজি রোজগারের সংস্থান গড়ে তুলতে পারবে না। তারা হবে পথের ভিখারি। কারণ, সরকার চাকরির প্রলোভন দেখালেও ভুক্তভোগী এবং শিক্ষিত মানুষমাত্রই জানেন যে, বর্তমানে আধুনিক শিল্পগুলিতে মানুষের কাজের সুযোগ কতটুকু। দক্ষ এবং অতিদক্ষ কর্মী সীমিত সংখ্যায় নিয়োগ হবে, যারা সরকার পরিচালিত অন্যান্য তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রেরই উদ্বৃত্ত কর্মী।

ফলে প্রস্তাবিত এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থানান্তরিত করার দাবি নিয়ে এলাকায় গড়ে উঠেছে 'নাগরিক সংগ্রাম কমিটি'। এই কমিটির উদ্যোগে গত ২ মার্চ গোবাগ মোড়ে এক গণকনভেনশনের আয়োজন করা হয়। এই কনভেনশনে বিভিন্ন গ্রাম থেকে শত শত মানুষ যোগ দেন। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন কমিটির সভাপতি প্রবীণ নাগরিক তারাপদ ব্যানার্জী, সম্পাদক অনিল বাউরী, রাজেন টুডু, ডাঃ ভাস্কর ভদ্র এবং প্রধান বক্তা স্বপন ঘোষ।

বীরভূম

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ডেপুটেশন

মিটার রিডিং না নিয়ে বিল করা, দীর্ঘদিন বিল না পাঠিয়ে এককালীন মোটা অঙ্কের বিল পাঠানো, খারাপ মিটারের ভাড়া নেওয়া, মিটার পরিবর্তনের জন্য জবরদস্তি টাকা আদায়, মোটা অঙ্কের ভুয়ো বিল, অ্যাভারেজ বিল পাঠানো ইত্যাদি বন্ধের দাবিতে গত ৪ মার্চ সিউড়িতে এস-ই'র নিকট বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একটি সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে। জমায়েতে বক্তব্য রাখেন নুরুল ইসলাম, রঞ্জিত দাস, মদন ঘটক, গোপীবল্লভ মজুমদার প্রমুখ। প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় এস-ই দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে অধিকাংশ দাবি পূরণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। ডেপুটেশনে অংশ নেন 'অ্যাবেকা'র রাজ্য কমিটির অন্যতম নেতা প্রদ্যোৎ চৌধুরী।

পুরুলিয়া

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির কর্মশালা

২৯ ফেব্রুয়ারি পুরুলিয়া শহরের রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হল 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি'র কর্মশালা। জেলার বিভিন্ন ব্লকের ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক, মহিলা এবং বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলে। জেলার পিএইচসিগুলি তুলে দেওয়া, মহকুমা এবং সদর হাসপাতালের অব্যবস্থা, সাপ ও কুকুরে কামড়ানো রোগীদের জন্য জীবনদায়ী ঔষধ সরবরাহ, হাসপাতালে পানীয় জলের ব্যবস্থা, রোগীর প্রতি কিছু ডাক্তার এবং নার্সের অমানবিক ব্যবহার, আই সি ইউ খোলা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন অংশগ্রহণকারী স্বাস্থ্যকর্মীরা।

আলোচনায় অংশ নেন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ডাঃ উজ্জ্বল আচার্য, ডাঃ গোপাল মাহাত, ডাঃ বিকাশ মাহাত, ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাঝি, ডাঃ মৃণালকান্তি ব্যানার্জী, ডাঃ সনাতন মাহাত, শিক্ষক সুব্রত মুখার্জী, শিক্ষক দয়াময় ভট্টাচার্য, জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাঃ ভাস্কর ভদ্র, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভানেত্রী প্রণতি ভট্টাচার্য এবং কর্মশালার মূল পরিচালক ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি।

সর্বশেষে আন্দোলন পরিচালনার জন্য জেলায় একটি শক্তিশালী প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়।

জলপাইগুড়ি

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির ডেপুটেশন

৪ মার্চ ডাঃ নর্মান বেথুন স্মরণ দিবসে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির উদ্যোগে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে সুচিকিৎসার দাবিতে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। তাতে দাবি করা হয়েছে — দু'বেলা নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক ডাক্তারবাবুকে তাঁর চিকিৎসাধীন অন্তর্বিভাগীয় রোগী পরিদর্শনে যেতে হবে, অন্তর্বিভাগে বেড এর সংখ্যা দ্বিগুণ করতে হবে, অনতিবিলম্বে দ্বিতীয় অপারেশন থিয়েটার চালু করতে হবে। হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষে জানানো হয়েছে — স্বাস্থ্য আধিকারিক উল্লিখিত দাবি সমূহের যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন এবং দাবিগুলি এক থেকে চার মাসের মধ্যে পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন। কমিটির পক্ষে বহ্নিশিখা সাহা বলেন, দাবি পূরণ না হলে আন্দোলন ব্যতীত বিকল্প পথ নেই।

বিদ্যুতের সিকিউরিটি ডিপোজিট সংক্রান্ত কমিশনের সিদ্ধান্তে আংশিক জয়

পূর্ণ বিজয়ের দাবিতে অ্যাবেকার আন্দোলনের আহ্বান

অবশেষে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন সিকিউরিটি ডিপোজিট সংক্রান্ত তাদের সিদ্ধান্ত গেজেট মারফত ঘোষণা করেছে। গেজেটে বলা হয়েছে —

ক) ১২ মাসের বিলের গড় হিসাবে ৩ মাসের টাকাই হবে গ্রাহকের সিকিউরিটি ডিপোজিট। এর সাথে লাইসেন্সির কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া মিটারের দামের ২৫ ভাগও সিকিউরিটি হিসাবে জমা দিতে হবে।

খ) সিকিউরিটি ডিপোজিট নগদ টাকায় অথবা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি হিসাবে দেওয়া যাবে।

গ) নতুন গ্রাহকদের ক্ষেত্রে কোম্পানি যে লোড ঠিক করবে তার তিন মাসের টাকার ভিত্তিতে সিকিউরিটি ডিপোজিট স্থির হবে।

ঘ) প্রি-পেড (অর্থাৎ অগ্রিম বিল) যারা দিতে রাজি থাকবে তাদের সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে না। কিন্তু এই প্রি-পেড গ্রাহকদের ১২ মাসের বিল অগ্রিম হিসাবে জমা দিতে হবে। তিন মাসের টাকা সব সময়ই জমা থাকতে হবে।

ঙ) প্রি-পেড গ্রাহকরা ইচ্ছা করলে এই টাকা নগদে দিতে পারে অথবা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি হিসাবে অথবা লেটার অফ ক্রেডিট হিসাবে অথবা প্রি-পেড মিটারের ভিত্তিতে দিতে পারবে।

চ) সিকিউরিটির উপর সুদ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দীর্ঘদিন ধরেই অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (অ্যাবেকা) পক্ষ থেকে বর্ধিত সিকিউরিটি চার্জের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল। সি ই এস সি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ তাদের খুশিমতো একতরফা বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির সাথে সাথে সিকিউরিটি বৃদ্ধি করে যাচ্ছিল। এবং এই সিকিউরিটি বিদ্যুৎ পর্ষদের পক্ষ থেকে লোড ভিত্তিক কোথাও ২ মাস, কোথাও ৩ মাসের টাকা দাবি করা হচ্ছিল। এই টাকা জমা না দিলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হচ্ছিল। এই অন্যায় আক্রমণে নাজেহাল বিদ্যুৎ গ্রাহকদের রক্ষা করার জন্য 'অ্যাবেকা' একদিকে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে, অন্যদিকে বিদ্যুৎমন্ত্রী, সি ই এস সি এবং বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছে বিক্ষোভ জানায়। সর্বশেষে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে কমিশনকে অবিলম্বে সিকিউরিটি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য দাবি জানানো হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয় যে, গ্রাহকদের সিকিউরিটি গড় বিলের ১ মাস থেকে দেড় মাসের বেশি হতে পারে না।

দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে কমিশন অবশেষে গ্রাহকদের আংশিক দাবি মেনে নিয়ে সিকিউরিটির হার ঘোষণা করেছে। কানেকটেড লোডের পরিবর্তে তিন মাসের গড় বিল সিকিউরিটি হিসাবে ঘোষণাটি গ্রাহকদের আংশিক জয়। এর ফলে গ্রাহকদের সিকিউরিটির বোঝা অনেকটা কমবে। গ্রাহকরা এখন থেকে সিকিউরিটির উপর সুদ পাবেন। এটাও গ্রাহকদের কিছুটা রিলিফ দেবে বলে অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস জানিয়েছেন।

অ্যাবেকা মনে করে এই জয়কে হাতিয়ার করে পূর্ণাঙ্গ জয় অর্জনের জন্য আরো বড় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

অ্যাবেকার পক্ষ থেকে আন্দোলনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে গত ৯ মার্চ ২০০৩, বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যানকে একটি প্রতিবাদলিপি পাঠিয়ে বলা হয়েছে যে, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এ স্পষ্টই বলা হয়েছে, মাশুল সংক্রান্ত বিষয়গুলো জনশুনানি করে স্থির করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে কমিশন কোন শুনানি না করে একতরফা ভাবে তা স্থির করে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি এমনকী আইনভঙ্গ করেছে। শুনানি করলে গ্রাহকদের পূর্ণাঙ্গ জয় নিশ্চিত ছিল।

চিঠিতে বলা হয়েছে কমিশনের উচিত হবে নতুন করে শুনানির ব্যবস্থা করা।

চিঠিতে আরো বলা হয়েছে যে, সি ই এস সি'র গ্রাহকদের ক্ষেত্রে মাসিক বিলের ব্যবস্থা রয়েছে এবং বিদ্যুৎ পর্ষদের ক্ষেত্রে তিন মাসের বিলের কথা বলা হলেও প্রতি মাসেই গ্রাহকদের বিল দিতে হচ্ছে। এবং প্রতি মাসে ডিউ ডেটের মধ্যে বিল না মেটালে ১৫ দিনের সময় দিয়ে লাইন কেটে দেওয়া হচ্ছে। তাই গ্রাহকদের সিকিউরিটি কোন মতেই এক মাস, আর নোটিশের ১৫ দিন যুক্ত করে দেড় মাসের বেশি হতে পারে না। কিন্তু কমিশন ৩ মাসের সিকিউরিটি ঘোষণা করে প্রকৃতপক্ষে আইন, ন্যায়নীতি ও গ্রাহকস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে গোয়েঙ্কার মতো বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের মদত দিয়েছে।

মিটারের জন্য আলাদা করে কোনদিনই সিকিউরিটি আদায় করা হয়নি। কিন্তু কমিশন এবার মিটারের ২৫ ভাগ সিকিউরিটি রাখতে নির্দেশ দিয়ে প্রকৃতপক্ষে গ্রাহকদের সিকিউরিটি বৃদ্ধি করেছে। প্রতিবাদ লিপিতে 'অ্যাবেকা' কমিশনের কাছে দাবি করেছে ঃ (১) অবিলম্বে শুনানি করে নতুন করে সিকিউরিটি নির্ধারণ করতে হবে, (২) দেড় মাসের গড় বিলকে সিকিউরিটি হিসাবে ঘোষণা করতে হবে, (৩) মিটারের জন্য আলাদাভাবে সিকিউরিটি আদায় করা চলবে না, (৪) এন এস সি'কেও সিকিউরিটি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, (৫) বছর শেষে সিকিউরিটির সুদ গ্রাহকদের নগদ টাকায় ফেরত দিতে হবে, (৬) গ্রাহকদের বকেয়া সুদ ৬ মাসে মিটিয়ে দিতে হবে।

অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস এক বিবৃতিতে রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলনের আংশিক জয়ের সংবাদ সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার এবং উপরোক্ত দাবিতে আন্দোলনকে আরো জোরদার করার জন্য আহ্বান করেছেন।

বাকি রইল চাঁদ আর মঙ্গলগ্রহ

এ-রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কেমন? রাজ্য সরকার বলছে ''ভালো''। কেমন ভালো? চমৎকার? না। তার চেয়েও ভালো। সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের প্রচারের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন, এ-রাজ্যে সবকিছুই সৃষ্টিছাড়া। আর্থিক বিকাশ, সামাজিক বনসৃজন থেকে শুরু করে মৎস্যচাষ — সর্বক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ নাকি ভারতে প্রথম। আর্থিক বিকাশে প্রথম, অথচ বন্ধ ও রুগ্ন কলকারখানার সংখ্যায় প্রথম না হয় দ্বিতীয়। মৎস্যচাষে প্রথম তবে মাছে নয়, ধানি পোনায়। সেই পোনা অন্ধ্রে গিয়ে মাছ হয়ে রাজ্যে চালান আসে। বঙ্গবাসী হাজার সমস্যায় খাবি খেতে খেতে মন্ত্রীদের মুখে 'ভারতে প্রথম' 'ভারতে প্রথম' মন্তর শুনে আসছে।

কিন্তু এতেও শেষ নয়, চমকের বাকি ছিল আরও। এ বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানিয়েছে, হাজার জন পিছু মৃত্যুহার কমের ক্ষেত্রে এ রাজ্য বিশ্বে প্রথম। পাঠক বিষম না খেয়ে শুনুন কী বলছে সরকার — ''**শুধুমাত্র ভারতের অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় নয়, সামগ্রিকভাবে গোটা পৃথিবীর অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলেও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের উন্নত অবস্থাটা কারও নজর এড়িয়ে যাওয়ার নয়। উন্নত দেশগুলিতে অর্থাৎ উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান, অস্ট্রেলিয়াতে (২০০০-২০০৫ এর আনুমানিক তথ্য অনুসারে) প্রতি হাজার জন মানুষের মধ্যে বছরে ৯ জন মানুষের মৃত্যু হয়, অনুন্নত দেশগুলিতে মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৪ জন, পশ্চিমবঙ্গে এই হার হাজারে ৬.৮ জন। অর্থাৎ উন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলির সঙ্গে তুলনা করলেও দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুর হার কম।**''।

(সূত্র ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত ''স্বাস্থ্য পরিষেবা — এক নজরে'' জানুয়ারি ২০০৪)

কী করে মৃত্যুহার কমল? সরকার বলছে — প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা, হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা — এজন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। এখানে নাকি দারিদ্র্যসীমারেখার নিচে অবস্থিত মানুষের সংখ্যা কম থাকা, পরিবার কল্যাণ, মানুষের সচেতনতা, সাক্ষরতার হার — এ সবের উন্নতিও ''পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুর হারকে সারা ভারতের গড়, বেশিরভাগ বড় রাজ্যের গড় এবং সারা পৃথিবীর গড়ের চেয়ে কম রাখতে সাহায্য করেছে।'' কোথা থেকে এ তথ্য পাওয়া গেল? রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলি, জনগণের ভাষায় 'ওয়ান ওয়ে' — রোগীরা হেঁটে ঢোকে, কাঁধে চড়ে বের হয় অন্য পথে। অজানা জ্বর, গ্যাসট্রো-এনট্রাইটিসে আধা-মড়ক প্রতিবছর হয়। অপুষ্টিতে ভোগে প্রচুর, কিন্তু সরকারি মতে মরে না। তাহলে কি আধমরা হয়ে বেঁচে থাকে সবাই? বেসরকারি তথ্য হলে বলা যেত বস্তু বিশেষে দম দিলে এমন তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এ খাঁটি সরকারি তথ্য, যেমন নাকি ইন্ডিয়া শাইনিং-এর তথ্য — চ্যালেঞ্জ করলে রাজদ্রোহের দায় বর্তাবে।

বিশ্বে না হয় প্রথম হওয়া গেল। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে? চাঁদ আর মঙ্গলগ্রহ থেকে খবর আসা বাকি!

পুনশ্চ ঃ ১১ ও ১২ মার্চ এই দু'দিনে বি সি রায় শিশু হাসপাতালে মোট ৭টি শিশু মারা যায়। সরকার বলেছে এগুলি সবই স্বাভাবিক মৃত্যু! অর্থাৎ এর দ্বারা স্বাস্থ্যব্যবস্থায় রাজ্যের 'প্রথম স্থান' নষ্ট হবে না।

পাঁশকুড়া ঃ খাজনা ও জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

পূর্বমেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া পুরসভায় রাস্তা, আলো, জলসহ নগরসভ্যতার উপযোগী প্রয়োজনীয় কোন ব্যবস্থাই গড়ে তোলা হয়নি। অথচ বিপুল হারে ট্যাক্সের বোঝা নাগরিকদের উপর চাপানো হয়েছে। জেলা ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক খাজনা তালিকা প্রকাশ করে জানিয়েছেন, 'শ্রেণী ঘ অন্তর্ভুক্ত তমলুক, পাঁশকুড়া ও কাঁথি পুর এলাকার জমির খাজনা কোন ক্ষেত্রে ৪/৫ গুণ, কোন ক্ষেত্রে ১২/১৩ গুণ বাড়ানো হচ্ছে'। খাজনা, রাজস্ব ও সারচার্জ সব মিলিয়ে হবে বাস্তুজমিতে প্রতি ডেসিম্যালে ৭ টাকা (ছিল ১ টাকা), আর বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জমিতে প্রতি ডেসিম্যালে ৩২ টাকা (ছিল ২ টাকা)। এই বিপুল পরিমাণ করের বোঝার আতঙ্কে পাঁশকুড়া এলাকার ক্ষুব্ধ মানুষজন গড়ে তুলেছেন পৌর নাগরিক কমিটি।

এই এলাকার দুই-তিন ফসলি বিরাট পরিমাণ জমি থেকে চাষীদের উচ্ছেদ করে জেলা পরিষদ সেই জমি কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ীদের বেশি দামে বিক্রি করবে এই কথা জানার পর উদ্বিগ্ন চাষীরা গড়ে তুলেছেন জমি সুরক্ষা সংগ্রাম কমিটি। পৌর নাগরিক কমিটি ও জমি সুরক্ষা সংগ্রাম কমিটি যুক্তভাবে পুরসভায় ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে বিক্ষোভ অভিযানের কর্মসূচি ঘোষণা করে প্রচার ও স্বাক্ষর সংগ্রহ চালায়। এই কর্মসূচিকে বানচাল করতে শাসকদলের পক্ষ থেকে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়। সমস্ত হুমকি উপেক্ষা করে অযৌক্তিক বর্ধিত খাজনা ও পুরকর চাপানোর প্রতিবাদে; জলনিকাশী, পানীয়জল, রাস্তা ও মাস্টারপ্ল্যান প্রকাশের দাবিতে এবং নগরায়নের নামে উর্বর তিন ফসলি জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকপত্র নিয়ে ৩ মার্চ তিন শতাধিক মানুষ বিক্ষোভ মিছিল করে দুটি দপ্তরে গণডেপুটেশন দেয়। পূর্বে জানানো সত্ত্বেও পুরসভার চেয়ারম্যান উপস্থিত থাকেননি। ভূমি সংস্কার আধিকারিক দাবিগুলির বাস্তবতা ও গুরুত্ব স্বীকার করেন। এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কোল ইন্ডিয়ার প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার প্রণয় কুমার দাস, জমি সুরক্ষা সংগ্রাম কমিটির সভাপতি গৌরচন্দ্র খাঁড়া এবং অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক উৎপল প্রধান, পৌর নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে সুনীল জানা ও অশোক ঘোষ, গ্রাহক উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক নলিনীকান্ত মাইতি, ফুলচাষী আন্দোলনের বর্ষীয়ান নেতা রতন দাস প্রমুখ। এই সমাবেশে ঘোষণা করা হয় আগামী ২৮ মার্চ গণকনভেনশনের মধ্য দিয়ে পরবর্তী জোরালো আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

ভোটের জোট, পাল্টা জোট করে সাম্প্রদায়িকতাকে রোখা যায় না

একের পাতার পর

সরকারেরই দায়িত্ব ছিল সে সত্য খুঁজে বের করে দেশের মানুষকে জানানোর, যেটা তারা করেনি। অন্যদিকে যতটুকু তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে জানা গেছে, ট্রেনের কামরায় পেট্রল ছোঁড়া হয়েছিল বাইরে থেকে, ভিতর থেকে নয়। যাঁরা মারা গিয়েছেন তাদের অধিকাংশেরই পরিচয় জানা যায়নি। ফলে হিন্দুত্ববাদী দাঙ্গাবাজরাই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে, বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপি'র বিজয় নিশ্চিত করার জন্য 'গোধরা' অজুহাত তৈরি করেছিল — এই অভিযোগের কোনও সদুত্তর বিজেপি দিতে পারেনি। আদবানিজীর এই দাবিও সত্য নয় যে, গুজরাট গণহত্যা ছাড়া বিজেপি'র গত চার বছরের শাসনে অন্য কোথাও দাঙ্গা হয়নি। (প্রতিবেদনের শেষে তথ্য দ্রষ্টব্য)।

আসলে, আদবানি ভারতযাত্রায় বেরিয়েছেন হিন্দুত্ববাদকে উস্কানি দিতেই। বিজেপি'র শাসনে 'উন্নয়ন'-এর স্লোগান যে কত বড় ভাঁওতা, সেটা সবচেয়ে ভাল জানেন বিজেপি নেতারাই। গত নভেম্বর মাসে হিন্দি বলয়ের চারটি রাজ্যের তিনটিতে বিজেপি'র অস্বাভাবিক বিজয়ের পরই তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, জয়ের হাওয়া থাকতে থাকতেই লোকসভার ভোট করে নিতে হবে যাতে বিজেপি আবার কেন্দ্রে বসতে পারে। ঐ নির্বাচনে বিজেপি'র জয় দেখিয়েই প্রচার তোলা হয়েছিল যে, হিন্দুত্ববাদ ছেড়ে বিজেপি উন্নয়নকে হাতিয়ার করেছে, সেই অর্থে বিজেপি'র রূপান্তর ঘটেছে।

ঐ নির্বাচনী ফলাফলের রাজনৈতিক বিশ্লেষণে আমরা লিখেছিলাম যে, ''হয় দৃষ্টিবিভ্রম থেকে না হয় জেনে বুঝে এই মিথ্যা প্রচারটিকে সাজানো হচ্ছে বিজেপিকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এককভাবে কেন্দ্রে পৌঁছবার রাস্তা করে দেওয়ার জন্য। বাবরি মসজিদ ধ্বংসকাণ্ডের একজন হোতা মধ্যপ্রদেশে গেরুয়াবসনা উমা ভারতী, রাজস্থানে নির্বাচনী প্রচারে সংখ্যালঘু হত্যার নায়ক নরেন্দ্র মোদি — এরাই তো বিজেপি'র রাজনৈতিক হিন্দুত্বের প্রতীক। এছাড়াও হাজার হাজার আর এস এস কর্মী সংগঠকদের অন্যান্য রাজ্য থেকে আনা হয়েছিল নির্বাচনে কাজ করার জন্য। জয়ের পর উমা ভারতীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ভিড় করেছিল ত্রিশূলধারী সাধুরা। চারদিকে ছিল 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের গিরিরাজ কিশোর, রামজন্মভূমি ন্যাসের নৃত্যগোপাল দাস এবং আর এস এস নেতা মদন দাস দেবি। জয়পুরে বসুন্ধরা রাজে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ছবি তুললেন নরেন্দ্র মোদিকে পাশে নিয়ে। আর ছত্তিশগড়ের রায়পুরে রমন সিং পূজা দিলেন 'দেবতাদের' — যার মধ্যে অন্যতম ছিল 'গো-মাতা'। নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি নেতারা '৩৭০ ধারা', 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি', 'সংখ্যালঘু তোষণ' চলবে না, 'অযোধ্যায় মন্দির চাই' ইত্যাদি বাঁধা স্লোগান দিলেন কি দিলেন না, তা দিয়ে প্রমাণ হয় না যে, বিজেপি হিন্দুত্বকে হাতিয়ার করছে না। উমা ভারতী, নরেন্দ্র মোদি প্রমুখের উপস্থিতিই উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রকাশ্য বা চাপা জোয়ার সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট।'' (গণদাবী, ১৯-১২-০৩)

এর সাথে আদবানির নাম যুক্ত করলেই হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রতীক সম্পূর্ণ হয়। এবং আদবানি ভারতযাত্রায় বেরিয়েছেন ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই। এবারের যাত্রায় দাঙ্গা হল কি হল না, কম হল না বেশি হল, সেটা মূল কথাই নয়, আসলে বিজেপি আদবানির এই যাত্রার মধ্য দিয়ে গোটা দেশে হিন্দুত্ববাদকে খুঁচিয়ে তুলে হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক গোছাতে চায়। রাজপথ দিয়ে আদবানির রথ যাবে, আর, তার ছড়ানো সাম্প্রদায়িকতার উত্তাপকে বজরং দল, বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও আর এস এস বাহিনী ছড়িয়ে দেবে শহরে-গ্রামে। এটাই বিজেপি'র নির্বাচনী হাতিয়ার। এছাড়া বিজেপি'র ঝুলিতে কিছু নেই।

রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ দেউলিয়া একটা দল এভাবে বারবার ভোটের স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করতে পারছে দেশের বড় বড় বামপন্থী দলগুলির সুবিধাবাদী ভোটসর্বস্ব রাজনীতির জন্যই। ভোটের অঙ্ক কষে জোট, পাল্টা-জোট গড়লেই সাম্প্রদায়িকতাকে রোখা যায় না, এটা ইতিমধ্যে বহুবার প্রমাণ হয়ে গেছে। বুর্জোয়াদেরই আর একটা দল কংগ্রেস যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যথার্থ শক্তি নয়, কংগ্রেসের ইতিহাসই তার প্রমাণ। সমস্যা-সঙ্কটে জেরবার মানুষ সমাধানের রাস্তা না পেয়েই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে যান। জনগণের বাঁচার দাবিগুলি নিয়ে গণআন্দোলনই একমাত্র মানুষকে এই বিভ্রান্তির ফাঁদ থেকে রক্ষা করতে পারে। এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পর্দা ফাঁস করে আড়ালে থাকা বুর্জোয়া শোষণের রক্ষকদের আসল চেহারা জনগণের সামনে দেখিয়ে দিতে পারে। এজন্যই সি পি এম, সি পি আইকে সর্বভারতীয় স্তরে ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বারবার আমরা এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে আবেদন জানিয়েছি, কিন্তু তারা সাড়া দেয়নি। এবারও দেখা যাচ্ছে, তারা বিজেপি'র সাম্প্রদায়িকতাকে রুখবার নামে কংগ্রেসের সাথেই নির্বাচনী জোট করার সুবিধাবাদী রাস্তা নিয়েছে, যেটা দেশের পুঁজিবাদী শাসনকেই আরও শক্তিশালী করবে এবং জনস্বার্থের চরম ক্ষতি করবে।

আদবানি সত্য বলেননি

বিজেপির চার বছরের শাসনে দাঙ্গা

	দাঙ্গার সংখ্যা	নিহত	আহত
১৯৯৯	৫২	৪৩	২৪৮
২০০০	২৪	৯১	১৬৫
২০০১	২৭	৫৬	১৫৮
২০০২	২৮	১১৭৩*	২২৭২
২০০৩	৬৭	৫৮	৬১১

* বেসরকারি হিসাবে শুধু গুজরাটেই ২০০০ জন মানুষ নিহত হয়েছেন। (তথ্য ঃ আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার; ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২৮ ফেব্রু-৫ মার্চ)

আদবানি কেমন মানুষ

১৯৯০ সালে আদবানির রথযাত্রা যখন রায়টযাত্রায় পরিণত হল, তখন অযোধ্যার রামমন্দিরের মুখ্য পুরোহিত মহন্ত লালদাস ঐ রথযাত্রার বিরোধিতা করেন। ১৯৯০-র ২৮ অক্টোবর টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া লিখেছিল 'পুরোহিত আদবানিকে রথযাত্রা থামাতে বললেন।' উগ্র হিন্দুত্ববাদের বিরোধী ঐ পুরোহিত ১৯৯৩ সালে অযোধ্যায় তাঁর বাড়িতেই খুন হন। কারা তাঁকে খুন করেছিল?

আর একটি ঘটনা। ১৯৯০-র রথযাত্রায় আদবানির উস্কানিমূলক বক্তৃতা এবং ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় আদবানির প্রত্যক্ষ ভূমিকার প্রমাণ স্বরূপ কাগজপত্র ছিল উত্তরপ্রদেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অফিসার সুভাষ ভান সাধ-এর কাছে। লিবেরহান কমিশনের কাছে সেই ফাইল নিয়ে সাক্ষ্য দিতে যাচ্ছিলেন সুভাষ ভান। ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লির পথে তিনি খুন হন। ফাইল উধাও হয়ে যায়। কারা তাঁকে খুন করেছিল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদবানির চেয়ে তা ভাল কেউ জানেন না। (সূত্র ঃ তিস্তা শীতলবাদের নিবন্ধ)

পি এফ-এর টাকাও শেয়ার-ফাটকার ফাঁদে

কর্মজীবনের শেষে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকায় কোনমতে দিন কাটবে ভেবে যাঁরা কিছুটা হলেও আশ্বস্ত ছিলেন — কেন্দ্রের সরকার এবার তাতেও ঘা দিল। এমনিতেই পি-এফের (এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড) কোটি কোটি টাকা মালিকরা আত্মসাৎ করে। তার পরেও কেন্দ্রের হাতে ১,৪৮,০০০ কোটি টাকা গচ্ছিত রয়েছে, যার জন্য সরকার সুদ দেয় মাত্র সাড়ে নয় শতাংশ। তাকেও এবার কমিয়ে ৯ শতাংশ করা হল।

কেন্দ্র আরও যে সর্বনাশা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা হ'ল এই তহবিলের ৪০ শতাংশ অর্থাৎ ৬০,০০০ কোটি টাকা শেয়ার বাজারে খাটানো যাবে, এমনকী পুরোনো শেয়ার হাতবদলের বাজারেও তা খাটানো যাবে। সরকারের অজুহাত অদ্ভুত। শেয়ার বাজারে খাটালে নাকি আয় বাড়বে!

পি এফের টাকাটা যেহেতু শ্রমিক-কর্মচারীদের শেষ সম্বল, কর্মজীবন শেষে পারিবারিক নানা দায়দায়িত্ব বহনে এই টাকাটাই শেষ অবলম্বন — তাই এতদিন এ-টাকার নিশ্চয়তা রক্ষার জন্য ৭০ শতাংশ রাখা হত সরকারি ঋণপত্রে বাকি ৩০ শতাংশ ডাকঘর, বিমা, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও রাজ্য সরকারের বন্ডে বিনিয়োগ করা হত। ফলে আসল টাকা ও সুদের একটা নিরাপত্তা ছিল। এবার বিজেপি সেটা বদল করে এর ৪০ শতাংশ শেয়ার বাজারে ঠেলে দিল। কেন তারা এটা করল? এর কি কিছু বাধ্যবাধকতা ছিল? ঘটনা কি এটাই যে, সরকার আর ঋণপত্র ছাড়বে না বা কম ছাড়বে? বা কম সুদে টাকা ধার নেবে? আদৌ তা নয়। অন্তর্বর্তী বাজেটে যেটুকু জানা গিয়েছে তাতে সরকারের আর্থিক ঘাটতি বিশাল। কাজেই তারা ধার করবে। তাহলে এতদিন পি এফ থেকে যেমন সরকার নিজে ধার করত, সেটা বন্ধ করার দরকার পড়ল কেন?

কারণ সরকারের নীতি হল সর্বাত্মক অনিশ্চয়তার মধ্যে অর্থনীতির যেখানে কিছুমাত্র স্থিরতা বা নিশ্চয়তা আছে, সেটা মালিকশ্রেণীর জন্য রিজার্ভ রাখা এবং মালিকশ্রেণীকে লাভ এবং লুঠের আরও বেশি সুযোগ করে দেওয়া। শেয়ারের ফাটকা বাজার এমনই একটা লুঠের জায়গা ; এবং রাঘব বোয়াল শেয়ার দালালরা বিজেপি'র খুবই ঘনিষ্ঠ। সংবাদে প্রকাশ, এরা বিজেপি'র নির্বাচনী তহবিলে কোটি কোটি টাকা দিয়েছে। শেয়ার বাজারের তেজি-মন্দা দুই অবস্থা থেকেই এরা মুনাফা লোটে। ৬০,০০০ কোটি টাকা বাড়তি এলে স্বভাবতই সম্প্রতি পড়ন্ত শেয়ার বাজার আবার চাঙ্গা হবে। বিজেপি এর দ্বারা এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছে।

প্রথমত, সম্প্রতি বিজেপি তার নির্বাচনী প্রচারের অঙ্গ হিসাবে 'ভারত উদয়'-এর যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, তাতে তারা দাবি করেছে শেয়ার বাজার খুব চাঙ্গা; যা প্রমাণ করে তাদের শাসনে অর্থনীতি বেশ মজবুত। আমরা তখনই গণদাবীতে বলছিলাম, শেয়ার বাজার চাঙ্গার পেছনে অর্থনীতির মজবুতি নেই, আছে ফাটকাবাজদের কিছু সন্দেহজনক বিনিয়োগ এবং বিদেশি লগ্নী। আমরা এও বলেছিলাম, এই ক্ষণস্থায়ী তেজিভাবকে যেভাবেই হোক নির্বাচন অবধি টানবার চেষ্টা বিজেপিকে করতে হবে। বর্তমান ফাটকাপুঁজির দাপটের যুগে শেয়ার বাজার দু-চার মাস একটানা চাঙ্গা রাখা খুব কঠিন। কারণ ফাটকা পুঁজি নেপথ্যে থেকে বাজারে ওঠা-নামা ঘটায় এবং দুই অবস্থা থেকেই মুনাফা কামায়।

'ভারত উদয়ে'র বিজ্ঞাপনের কালি শুকোবার আগেই শেয়ার বাজার পড়তে শুরু করেছে। এই অবস্থায় বাজার তেজি করতে একদিকে লাভজনক এবং স্ট্র্যাটেজিক সরকারি সংস্থা, যার সঙ্গে দেশের নিরাপত্তা জড়িত, সেই ও এন জি সি-র শেয়ার বাজারে এনেছে বিজেপি, যাতে বিনিয়োগ বিশেষত বিদেশি বিনিয়োগের স্রোত ভোট পর্যন্ত অন্তত টানা যায়। এর পরেই এসেছে পি এফের ৬০,০০০ কোটি টাকা শেয়ার বাজারে ঢালার সিদ্ধান্ত, যা বাজার চড়ার এবং তেজিবাজারে বাড়তি মুনাফা কামানোর আশাকে তুঙ্গে তুলবে।

ক্রমশ নেতিয়ে পড়া শেয়ার বাজার আপতত চাঙ্গা করা ও ভোটের আশু স্বার্থ গোছানোর জন্য বিজেপি নির্লজ্জভাবে কোটি কোটি শ্রমিক-কর্মচারীর শেষ জীবনের সম্বলকে অনিশ্চিত ফাটকা বাজারে ঠেলে দিল। অতঃপর শেয়ার বাজারে মন্দার দায় তো বটেই, এমনকী ফাটকাবাজদের লুঠের ফলে শেয়ার বাজার মুখ থুবড়ে যখন পড়বে — তার দায়ও বইতে হবে শ্রমিক-কর্মচারীদের। এর পরেও 'সুরাজে'র গর্ব করে বিজেপি।

সিউড়িতে

যুব অবস্থান ও ডেপুটেশন

জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে সারা ভারত ডি ওয়াই ও'র পক্ষ থেকে কর্মক্ষম যুবকদের চাকরি অথবা উপযুক্ত বেকারভাতা ও স্বল্প সুদে সহজলভ্য ব্যাঙ্ক ঋণের দাবিতে এবং মদের ঢালাও লাইসেন্স, মোটর সাইকেলের আজীবন কর, পঞ্চায়েতি ট্যাক্স, অশ্লীল সিনেমা ও পত্র-পত্রিকা প্রচার, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে গত ২০ ফেব্রুয়ারি যুব অবস্থান ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হয়। সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড শম্ভু ব্যানার্জী এবং সহ-সম্পাদক কমরেড মানস সিংহ সহ বিভিন্ন বক্তা সভায় বক্তব্য রাখেন।

জেলা শাসকের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি কালেকটর প্রতিনিধিদের কাছ থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন ও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রতিকারের আশ্বাস দেন।

মার্কিনী গণতন্ত্রে জেলব্যবসা

বিশ্বের মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝেছে, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ শুধু অর্থনৈতিকভাবেই নির্মম শোষণ করে না, এই অর্থনৈতিক শোষণ জারি রাখতে তারা রাজনৈতিক-সামাজিকভাবেও নিষ্ঠুর অত্যাচার চালায়। এজন্য যেমন তারা পররাজ্য আক্রমণ করে দখল করে, অন্যের সার্বভৌমত্ব কেড়ে নেয়, গণহত্যা চালায়, দেশের সম্পদ লুঠ করে, জনগণকে বন্দী করে পাশবিক অত্যাচারের শিকার বানায় — তেমনি নিজের দেশেও ধনকুবের গোষ্ঠীর ধন স্ফীত করে, নির্ধনকে ভিখিরি করে, অনাহারে আত্মহত্যায় ঠেলে দেয়, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু ঘটায়, শিক্ষা সংকোচন করে, দুর্নীতি করে। আবার শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করতে নিষ্পেষণের বন্যা বইয়ে দেয়, নিজের দেশের মানুষকেই খুন করে, গুম করে, জংলি আইন তৈরি করে বিনা বিচারে বছরের পর বছর জেলে পচিয়ে মারে, অত্যাচারে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে পাগল করে দেয়, সারা জীবনের জন্য পঙ্গু করে দেয়। এবং এ সবই তারা করে গণতন্ত্রের নামে। গণতন্ত্রের নামেই দেশকে প্রায় কারাগারে পরিণত করে।

সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন শাসকরা ঠিক এটাই করছে বিদেশে এবং স্বদেশে। এ বিষয়ে যতটুকু সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, তাতেই উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে তাদের ভয়ঙ্কর পৈশাচিক চরিত্র। গণতন্ত্রের নামাবলি গায়ে দিয়ে গণতন্ত্রের 'অখণ্ড সংকীর্তন' করতে করতেই তারা তাদের ফ্যাসিস্ট হিংস্র নখদন্ত প্রকাশ করছে।

বস্তুত মার্কিন শাসকদের আভ্যন্তরীণ 'গণতন্ত্র' এমনই প্রসারিত যে, ১৯৭১ সালে দেশে জেলবন্দীর সংখ্যা যেখানে ছিল ৩ লক্ষ, বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ২১ লক্ষে। এ হল সরকারিভাবে জেলে আটকদের সংখ্যা যা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। যাদের 'সংশোধনে'র নামে আটক করা হয়, আসলে তারাও জেলবন্দী, তাদের ধরলে সংখ্যাটা ভয়ঙ্কর — ৬৬ লক্ষেরও বেশি। ১৯৭০ থেকে '৯৯ সাল পর্যন্ত সরকারি বন্দী ৫০০ শতাংশ বেড়েছে। সংখ্যাটা পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির তুলনায় ৮ গুণ বেশি, জাপানের থেকে ১৭ গুণ বেশি। ১৯৯৯ সালের একটি তথ্য বলছে, ৭টি শিল্পোন্নত দেশে (জি-৭) প্রতি ১ লক্ষ লোক পিছু বন্দীর সংখ্যা যেখানে জাপানে ৪০, ইটালিতে ৯০, জার্মানিতে ৯৫, কানাডায় ১১০, ব্রিটেনে ১২৫ — সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিল ৬৮০। ২০০০ সালে সেটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৭০২। (৯০ দশকের প্রথম দিকে এটা ছিল লক্ষ প্রতি ৪৫৮)। সংখ্যাটা ২০০৩ সালে আরো বেশি হয়েছে — যা অনেক দেশের মোট জনসংখ্যার থেকেও বেশি। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও মার্কিন মুলুকে জেলবন্দীর সংখ্যা তখনই কমে, যখন ঐ দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা পরদেশ আক্রমণ করে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। কোরিয়ার যুদ্ধের সময় এটা হয়েছিল। ভিয়েতনাম আক্রমণের সময় তো জেলবন্দীর সংখ্যা বিস্ময়করভাবে কমেছিল — ১৯৬৮ সালে ছিল লক্ষ প্রতি মাত্র ৯৪.৩ জন। কিন্তু ভিয়েতনামে লজ্জাজনক পরাজয়ের পর যুদ্ধ শেষ হতেই আবার তা ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে আজ এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। এইভাবেই যুদ্ধের ওপর ওইদেশে জেলবন্দীর সংখ্যা বাড়া-কমা নির্ভর করে। সহজ কথায়, যুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ সৈন্যের প্রয়োজন হয়। অন্যসময় নানারকম অভিযোগে যেসব যুবকদের জেলে পুরে দেওয়া হয়, যুদ্ধের সময় তাদের জেলের পরিবর্তে 'দেশপ্রেমিক' সাজিয়ে কিছু টাকার বিনিময়ে প্রায় জোর করেই যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় তারা হয়ে পড়ে 'সমাজবিরোধী', 'দেশদ্রোহী', নির্বিচারে তাদের আবার জেলে পোরা হয়। আরো জঘন্য ব্যাপার হল, পুঁজিবাদী সঙ্কটের অমোঘ নিয়মে দেশে যে লক্ষ কোটি বেকারের জন্ম হচ্ছে, সেই বেকারের সংখ্যাকে কম করে দেখানোর জন্যও তাদের জেলে বন্দী করে রাখা হয়। এমনকী বেআইনিভাবেও আটকে রাখা হয়। আলাবামা প্রদেশের এক ফেডারেল জজ গত ১৯ মে ২০০১ এরকম দু'হাজার জেলবন্দীকে বেআইনি বলে ঘোষণা করেছেন। (নিউ ইয়র্ক টাইমস, ২০-৫-০১)

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জেল আজ বহুজাতিক সংস্থাগুলোর লাভজনক ব্যবসাকেন্দ্র। ব্যক্তিমালিকদের মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলার আর একটি 'শিল্পপ্রতিষ্ঠান'। সরকার ব্যক্তিমালিকদের হাতে জেল ব্যবস্থা তুলে দিচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে জেল নির্মাণের অনুমতি দিচ্ছে। এই জেল নির্মাণ করে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বছরে ১০০ কোটি ডলার লাভ করে। জেল ব্যবস্থাকে সরকার দ্রুত বেসরকারীকরণ করছে। গত দশকে ২৮টি রাজ্যে আইন করে বেসরকারি ঠিকাদারদের হাতে জেলের ভার তুলে দেওয়া হয়েছে। অজুহাত দিয়েছে, বিশাল বাজেট ঘাটতির হাত থেকে বাঁচা। এইভাবেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সুপরিকল্পিতভাবে তাদের দেশে জেলবন্দীদেরও একটা সংরক্ষিত পণ্য বানাচ্ছে।

উল্লেখ্য, উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার গোটা কারাগার ব্যবস্থা বেসরকারি ছিল। লক্ষ লক্ষ 'দাস'কে বন্দী করে তাদের দিয়ে বিনা মজুরিতে জেল মালিকরা কাজ করিয়ে উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি করে কোটি কোটি ডলার মুনাফা লুটেছে। ঘিঞ্জি নোংরা সেলে রেখে তাদের ওপর এমন হিংস্র অত্যাচার চালানো হত যে, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই দাসবন্দীদের মহাবিদ্রোহ মার্কিন সরকারকে ব্যক্তিমালিকানাধীন কারাগার ব্যবস্থাকে বেআইনি ঘোষণা করতে বাধ্য করেছিল। সেই থেকে সরকারই কারাগার চালাচ্ছিল। কিন্তু '৯০ দশকে পুঁজিবাদী তীব্র বাজার সঙ্কট থেকে সকল ক্ষেত্রকেই ব্যক্তিমালিকদের মুনাফার জন্য খুলে দেওয়ার নীতি থেকেই আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কারাগার ব্যবস্থাকে বেসরকারীকরণের আওতায় নিয়ে আসে। এখন আড়াই লক্ষ জেল এই ব্যক্তিমালিকদের অধীনে। এই জেল নিয়ে এমনকী শেয়ারের ব্যবসাও চলছে। 'কারেকশন করপোরেশন অব আমেরিকা' এই জেল ব্যবসায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের শেয়ারের দাম ১৯৯৭ সালে ছিল ৮ ডলার, সেটা বেড়ে এখন ৩০ ডলার হয়েছে। বেসরকারি এই জেলের আয় ২০০১ সালে দুশো কোটি ডলার ছাপিয়ে গিয়েছে। অথচ যে বন্দী শ্রমিকদের দিয়ে তারা পণ্য উৎপাদন করে এই বিশাল মুনাফা করছে, তাদের কোথাও ঘণ্টা পিছু মাত্র ১.১০ ডলার, কোথাও ২.০৫ ডলার দেওয়া হয়। ওহিও প্রদেশে ওয়েস্ট করপোরেশন (Waste Corporation) নামে একটি সংস্থা হোন্ডা কোম্পানির গাড়ির যন্ত্রাংশ জোড়া দেওয়ার সমস্ত কাজটাই বন্দীদের দিয়ে ঘণ্টা পিছু ২.০৫ ডলারের বিনিময়ে করিয়ে নেয়। এই জন্য মালিকরা আরো বেশি বেশি বন্দীর জন্য আকুল হয়। সিংসিং জেলের একজন অফিসার নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''I am praying for more prisoners'' (''আমি আরো বেশি বন্দীর জন্য প্রার্থনা করছি'')। মার্কিন অর্থনীতির অন্যতম অবলম্বন আজ জেলখানা। প্রতিনিয়ত জেলে বন্দীর সংখ্যা বাড়ানো এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শুধু তাই নয়, মার্কিন সরকার নিজেদের পরিচালিত জেলগুলোতে একইভাবে বন্দীর সংখ্যা বাড়াচ্ছে, জেল সংখ্যা বাড়াচ্ছে, জেলখাতে বরাদ্দ বাড়াচ্ছে, আর এই বর্ধিত অর্থ তারা যোগাড় করছে শিক্ষায় বরাদ্দ কমিয়ে। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে শুধু নিউ ইয়র্কেই উচ্চশিক্ষায় ১০০ কোটি ডলার বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলোকে জেলের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস বা পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহের বরাত দিয়ে কোটি কোটি ডলারের মুনাফা সুনিশ্চিত করেছে। সঙ্গে সঙ্গে জেল নির্মাণও তাদের দিয়ে করাচ্ছে। এটা দেখেই নিউ ইয়র্কের একটি লগ্নীকারী সংস্থা ওয়ার্ল্ড রিসার্চ গ্রুপের সম্মেলনের এক পুস্তিকায় বলা হয়েছে, বহুজাতিক সংস্থাগুলোর দ্বারা এই 'সংশোধনাগার' অর্থাৎ জেলখানা অধিগ্রহণ হচ্ছে ''সরকারি কর্মসূচীগুলিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনার একেবারে নতুন বৈশিষ্ট্য। গ্রেপ্তার ও শাস্তির ঘটনা যখন একটানা বেড়েই চলেছে তখন এই ক্রাইমের জগৎ থেকেই মুনাফা করতে হবে। এই উঠতি শিল্পে জায়গা নেওয়ার জন্য এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ো।'' ''...newest trend in the area of privatizing government run programmes — while arrests and conviction are steadily on the rise (nationally), profits are to be made — profits from crime. Get in on the ground floor of this booming industry now''!

সেইজন্যই মার্কিন মুলুকে জেলখানা মানে আতঙ্ক। অন্ধকার খুপরির মতো একজনের একটি সেলে তিনজন বন্দীকে গাদাগাদি করে রাখা হয়। লোহার বেড়ি পরিয়ে জেলবন্দীদের বেগার খাটানো হয়। এই আলাবামা প্রদেশেরই আর একজন ফেডারেল জজ ঐ প্রদেশের জেলকে দাসবাহী জাহাজের সাথে তুলনা করেছেন। (নিউ ইয়র্ক টাইমস, ২০-৫-০১) নিপীড়ন-অত্যাচারের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বিক্ষোভ দেখালে বন্দীদের গুলি খেয়ে মরতে হয়। নিউ ইয়র্কের কুখ্যাত অ্যাটিক কারাগার নাৎসি জার্মানির বন্দী শিবিরের (concentration camp) নিখুঁত প্রতিলিপি। প্রতি মুহূর্তে নৃশংস অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বন্দীরা যখন বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল, তখন নিউ ইয়র্কের গভর্নর নেলসন রকফেলার পুলিশ দিয়ে গুলি চালিয়ে ৪৩ জন বন্দীকে খুন করেছিল। মনে রাখতে হবে, জেলখানায় এই অবস্থা ও অত্যাচার সুদূর অতীত কাল থেকেই আমেরিকায় চলে আসছে। এটা দেখেই চার্লস ডিকেন্স আঁৎকে উঠেছিলেন। তাঁর ১৮৪৩ সালের বিখ্যাত ''America Notes for General Circulation''-এ এই ভয়ঙ্কর চিত্রেরই প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। এই হল পুঁজিবাদ — তার নির্দয় রূপ, তার বীভৎস জুলুম।

শুধু তাই নয়। জেলবন্দী করার প্রশ্নে 'মানবাধিকার রক্ষার একচেটিয়া ইজারাদার' মার্কিন শাসকদের নিকৃষ্ট বর্ণবিদ্বেষী চরিত্রও প্রকটভাবে বেরিয়ে আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জেলবন্দীদের বেশিরভাগই কৃষ্ণাঙ্গ, প্রায় ৬৬ শতাংশ। সাদা-কালোর অনুপাত ১ ঃ ১০। অথচ মার্কিন দেশে মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৫% হল সংখ্যালঘু কৃষ্ণাঙ্গ। জাস্টিস পলিসি ইনস্টিটিউট (আমেরিকার বিচারব্যবস্থার একটি স্বশাসিত সংস্থা) দেখিয়েছে, ২০০১ সালে কৃষ্ণাঙ্গ জেলবন্দীর সংখ্যা ওখানকার কলেজগুলোর মোট ছাত্রসংখ্যার থেকেও বেশি। বহুজাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রচারমাধ্যমগুলো গোটা কৃষ্ণাঙ্গ যুবসমাজকে এক দানবীয় হিংস্র প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত করে, যাতে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন রাখা যায়। এইভাবেই তাদের ওপর নিষ্ঠুর নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। এটা কি মানবাধিকার লংঘন নয়? শুধু দেশেই নয়, দখল করা বিদেশের মাটিতেও জেলবন্দীদের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এইরকম নৃশংস অত্যাচার করে। আমরা দেখেছি ভিয়েতনামে, ইরাকে, যুগোশ্লাভিয়ায়, আফগানিস্থানে জেলবন্দীদের উপর এই অত্যাচারের ভয়ঙ্কর রূপ। এই হিংস্র অত্যাচারের জন্যেই এমনকী মার্কিন প্রভাবিত অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল পর্যন্ত মার্কিন শাসকদের বিরুদ্ধে সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন, নিয়মনীতি লংঘনের সরাসরি অভিযোগ এনেছে। অভিযোগ বিশেষ করে তাদের বর্ণবিদ্বেষী মনোভাব থেকে গরিব মানুষকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর বিরুদ্ধে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এমন ভয়ঙ্কর মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা 'বাকস্বাধীনতার পূজারী', 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রবক্তা' মার্কিন দেশের সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না। মার্কিন সরকারের মানবাধিকার লংঘনের এমন জঘন্য বর্ণবিদ্বেষী ক্রিমিনাল আচরণ তারা উদ্‌ঘাটিত করে না।

বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন, জেফার্সনদের গৌরবময় সংগ্রাম, তাদের আত্মবলিদান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য তাদের আপসহীন লড়াইয়ের প্রতিদান এভাবেই বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন শাসকরা দিচ্ছে!

শুধু কি তাই? মার্কিন সমাজে মহিলা বন্দীর সংখ্যা যেমন অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে, তেমনি তাদের ওপর সীমাহীন অত্যাচারও চলছে। এই মহিলাদের ৭০ শতাংশই মাদক ব্যবসায়ে বা মাদকাসক্তির সাথে যোগ থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত। 'অসামাজিক অপরাধ' ছাড়াও 'রাজনৈতিক অপরাধের' জন্যও অসংখ্য মহিলাকে জেলে পোরা হয়। সীমান্ত রেখা পার হওয়ার মত সামান্য দোষেও বছরের পর বছর জেলে পচিয়ে মারা হয়। এমনও হয়েছে, সরকারের বিদেশনীতির সমালোচনা করার অপরাধে একজন মহিলাকে ১৪ বছর জেল খাটতে হয়েছে। একজন মহিলাকে জীবনের প্রথম অপরাধেই ২৪ বছর জেলে ঘানি টানতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, জেলে এই মহিলাদের নিরাপত্তা শূন্যের কোঠায়। শুধু শারীরিক-মানসিকই নয়, চলে এই অসহায় নারীদের ওপর অবাধ যৌন নির্যাতনও। বহু বন্দী নারীকেই অবৈধ সন্তানের বোঝা বইতে হয়। অনেকেই এইড্‌স রোগের শিকার। অসংখ্য মহিলা চিরজীবনের মত পঙ্গু। এই শাসকরা মানবাধিকারের এমনই 'চ্যাম্পিয়ন', নারীর মর্যাদারক্ষার এমনই 'অতন্দ্রপ্রহরী' যে, জেলগুলোতে মহিলা বন্দীদের হয় কথায় নয় কথায় দেহ তল্লাসি করে পুরুষ কর্মচারীরা। নারীত্বের এই অবমাননার প্রতিবাদ করলে শুরু হয় নির্যাতন। পুরুষরাই ওদের প্রহরী। একটু

ছয়ের পাতায় দেখুন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবসে সভা সমাবেশ

ঝাড়খণ্ড

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উপলক্ষে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জামশেদপুরের সাঁকচী গোল চক্করে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পূর্ব সিংভূম ও সরাইকেলা জেলা এম এস এস-এর পক্ষ থেকে এক ধরণার আয়োজন করা হয়। এই ধরণাতে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শতাধিক মহিলা অংশগ্রহণ করেন। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সভানেত্রী কমরেড সরলা মাহাতো। সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন কমরেড চন্দনা ব্যানার্জী, মৌসুমী মিত্র, কমলিনী সর্দার, সবিতা বোস, সুমিতা রায়, সুজাতা বারিক। কমরেড সনকা মাহাতো বলেন, ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ডাইনি অপবাদে মহিলাদের হত্যা করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন সোচ্চার হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলছে। পুরুষশাসিত সমাজের শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য মালতী দেবী আহ্বান জানান।

৮ মার্চ জামশদপুরের সাঁকচিতে ধরণা

দিল্লিতে বিদেশিনী মহিলা ও পুরুষোত্তম এক্সপ্রেসের নেপালি মহিলা যাত্রীর ধর্ষণের উদাহরণ তুলে ধরে কমরেড চন্দনা ব্যানার্জী বলেন, এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড লিলি দাস বলেন, বিউটি কনটেস্ট ও ফ্যাশন শো'র দ্বারা মহিলাদের সম্ভ্রমহানি করা হচ্ছে। সর্বশেষে সভানেত্রী কমরেড সরলা মাহাতো বলেন, রাজস্থানের রূপ কানোয়ারের হত্যার মামলায় দোষী ব্যক্তিদের নির্দোষ ঘোষণা করার দ্বারা বিজেপি সরকার পুরানো সামন্তী চিন্তায় উস্কানি দিয়ে যাচ্ছে। সংবিধানে পণপ্রথা বিরোধী আইন থাকা সত্ত্বেও ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী কন্যাদান যোজনার মাধ্যমে পণপ্রথাকেই উৎসাহিত করছেন। প্রকৃত নারীমুক্তির জন্য পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সঠিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রগতিশীল মহিলা আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

মুর্শিদাবাদ

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা ৮ মার্চ বহরমপুর গ্রান্ট হলে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করল নিম্নলিখিত দাবিগুলির ভিত্তিতে ঃ

জনসাধারণ তথা নারীসমাজের ন্যূনতম অধিকার হরণের চক্রান্ত ও মহিলাদের গ্রেপ্তার করা প্রসঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের অগণতান্ত্রিক রায় প্রত্যাহার করতে হবে ; পারিবারিক হিংসা বিল প্রত্যাহার করতে হবে ; রূপ কানোয়ার হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মুক্তি নয়, নতুন করে মামলা করে হত্যাকারীদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

দ্বিশতাধিক মহিলার এই সমাবেশে সংগঠনের সর্বভারতীয় সহসভানেত্রী অধ্যাপিকা মেনকা বসুরায় ভারতবর্ষ সহ প্রতিবেশী দু'টি দেশের উদাহরণ দিয়ে দেখান আজও মেয়েরা কীভাবে কলে-কারখানায় অত্যাচারিত হচ্ছেন। তিনি সর্বস্তরের মহিলাদের এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অধ্যাপিকা সন্ধিনী রায়চৌধুরী বলেন, নারী সমাজের মুক্তির প্রশ্নটি সমাজের আমূল পরিবর্তন এবং সমাজের শোষিতশ্রেণীর মুক্তির প্রশ্নের সাথে জড়িত। নারী সমাজকে সেই লক্ষ্যেই আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

অধ্যাপিকা ইন্দুলেখা চক্রবর্তী পণপ্রথা প্রতিরোধের জন্য 'পণ দেব না, পণ নেব না'র সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানান। শিক্ষিকা দেবী ঠাকুর তাঁর বক্তব্যে নারীশক্তি জাগরণের আহ্বান জানান। জেলার প্রবীণ সাংবাদিক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী বলেন, নারীসমাজের যে অমর্যাদা ও দুর্গতি, তাদের প্রতি যে আদিম বর্বরতা সংগঠিত হচ্ছে তা শুধু আমাকে উদ্বিগ্নই করছে না, এই সমাজের একজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসাবে, একজন মায়ের সন্তান হিসাবে আমি নিজেও অপরাধবোধ করছি। আইনজীবী অনুরাধা মণ্ডল গভীর বেদনা নিয়ে জানান, রঘুনাথগঞ্জে গণধর্ষণের শিকার ৮ বছরের শিশুকন্যাকে হাসপাতালে দেখতে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি নিয়ে এস ডি পি ও'র কাছে গিয়েছিলেন বলে সভায় আসতে তাঁর দেরি হয়েছে।

৮ মার্চ বহরমপুরের সভায় বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপিকা মেনকা বসুরায়

জেলা সম্পাদিকা পূর্ণিমা কর্মকার তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে কোন্ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক নারীদিবস পালিত হচ্ছে তা তুলে ধরেন। সংগঠনের সভানেত্রী প্রতিমা সিরাজ এই অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন এবং সমাপ্তি ভাষণে বলেন, নারী সমাজ পায়নি অনেক কিছুই, কিন্তু যা পেয়েছে তাও কি সত্যিকার পাওয়া? তার ভোটাধিকার তো গৃহকর্তার বাড়তি ভোটাধিকারে পর্যবসিত।

সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করে মাঙ্গলিক সাংস্কৃতিক সংস্থা, আবৃত্তি করেন মধুমিতা চন্দ্র ও মণিদীপা ভট্টাচার্য।

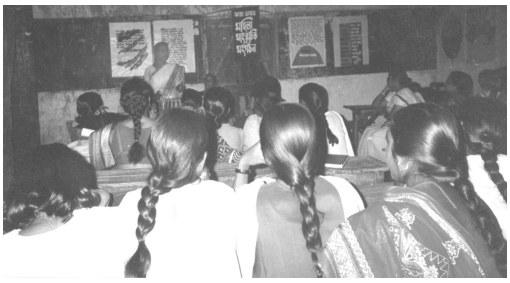

(উপরে) ৮ মার্চ পুরুলিয়ার সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা সভানেত্রী প্রণতি ভট্টাচার্য। (পাশে) কলকাতার এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের সামনে সভা

বন্দীরাও ব্যবসার পণ্য

পাঁচের পাতার পর

সুবিধা পাওয়ার বিনিময়ে, বা প্রাপ্য জিনিষটুকুর সবটা পেতে হলে দিতে হয় নারীত্ব। এমনকি স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করাতে এলেও তাদের সম্ভ্রমের ওপর আক্রমণ হয়। জেলগুলোতে সাধারণভাবেই চিকিৎসা অত্যন্ত নিম্নমানের, মহিলাদের ক্ষেত্রে আরো বেশি। প্রায় বিনা চিকিৎসায় বহু বন্দী মারা যায়।

এই জেলতন্ত্র থেকে শিশুদের পর্যন্ত নিস্তার নেই। তাদের প্রতিও মার্কিন শাসকদের কোন মমতার ছোঁয়া বা করুণার দৃষ্টি নেই। জেলে আটকে রেখে অমানুষিক অত্যাচার করা একটা সাধারণ নিয়ম। নিজের দেশের শিশুদের উপরও করছে, বিদেশের শিশুদের উপরও একই অত্যাচার করছে। গায়ের জোরে দখল করা কিউবার গুয়ান্তানামোর অন্ধকূপ জেলে বিভিন্ন দেশের ১৩-১৫ বছরের কয়েকশ' শিশুকে বছরের পর বছর আটকে রেখে তাদের উপর নৃশংস অত্যাচার করেছে। এদের কোন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয় না। পেন্টাগনের সামরিক অফিসাররা সাফাই গাইছে যে, ঐ শিশুদের জন্য তারা পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছে, ইংরেজি শেখাচ্ছে, তাদের ভিডিও দেখানো হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো কতখানি সত্য তার প্রমাণ মেলে যখন দেখা যায়, কমপক্ষে ২১ জন শিশুবন্দী ৩০ বারেরও বেশি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। বহু শিশু দীর্ঘ বন্দীদশার ফলে মানসিক অবসাদে ভুগছে। মানবাধিকার রক্ষার একমাত্র ইজারাদারই বটে!

এই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন শাসকদের গণতন্ত্রের রূপ। মানবাধিকার রক্ষার মহান অবতার এরা! এই 'গণতন্ত্র' ও 'মানবাধিকারে'র জন্যই নাকি তারা দেশে দেশে আক্রমণ করে, ধ্বংস করে, লুঠ করে, লক্ষ লক্ষ নারী-শিশু-বৃদ্ধ খুন করে, বিশ্বের প্রাচীনতম সমৃদ্ধ সভ্যতার নির্দশনকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়, বিষাক্ত পারমাণবিক বা জৈবিক বা রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করে ঐসব দেশের জলবায়ু কয়েক প্রজন্মের জন্য বিষিয়ে দেয়, ঐ সব দেশ দখল করে, নিরীহ মানুষকে গ্রেপ্তার করে অমানুষিক অত্যাচার চালায়। আবার নিজের দেশে ইউ এস প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট ২০০১ প্রয়োগ করে সারা দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ বন্ধ করে দেয় — এমনই ভয়ঙ্কর 'গণতন্ত্র' ও 'মানবাধিকার'-এর ধারক হচ্ছে মার্কিনী গণতন্ত্র।

এ ব্যাপারে ভারতীয় গণতন্ত্রও পিছিয়ে নেই। এদেশে জেলখানাগুলিকে এখনও বেসরকারীকরণ করা হয়নি — যদিও সেই ভাবনা শাসকমহল থেকে ইতিমধ্যে ব্যক্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু বন্দীদের প্রতি নির্মম আচরণে ও অত্যাচারে ভারতীয় গণতন্ত্র মার্কিন গণতন্ত্রের অনুসারীর দাবি করতেই পারে। বিহারের জেলে বন্দীদের অন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা অনেকেরই স্মরণে আছে। কিছুকাল আগে পশ্চিমবঙ্গের মালদায় কোর্ট চত্বরের বন্দীশালায় ভীড়ের চাপে, পানীয় জলের অভাবে বন্দীদের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ভুলে যাওয়ার নয়। জেলের ভিতরে বিনাবিচারে কত বন্দীকে পচিয়ে মারা হয়, সাধারণ বন্দীরা কী নিদারুণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বছরের পর বছর কাটায়, নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন কী ব্যাপক হারে চলে, তার ২/১টি ঘটনা মাঝে মধ্যে প্রকাশ পেয়ে ভয়াবহ অবস্থার ইঙ্গিতটুকু দিয়ে যায় মাত্র। বাস্তবে ভারতেও জেলের ভিতরকার পরিবেশ আজও আদিম স্তরেই রয়েছে।

সুতরাং, কেবল আমেরিকা নয়, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ধ্বজা ওড়ানো সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের ভিতরে খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, 'সংশোধনাগারে'র নামের আড়ালে সেখানে বন্দীশালাগুলিতে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে হত্যা করা হচ্ছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র আজ পুঁজির জন্য উচ্চতম মুনাফা লুটের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ছাড়া অন্য কোনও দায়িত্বকে 'পবিত্র' মনে করে না, দেশের মানুষের জীবনের কোনও মূল্য তাদের কাছে নেই। এহেন ভুয়া 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা'কে টিকিয়ে রেখে জনগণের লাভ কী? বরং যত শীঘ্র একে উচ্ছেদ করা যায় ততই জনগণের স্বস্তি।

চাষীর আত্মহত্যা

‘উন্নততর’ বামফ্রন্টের পলেস্তারা খসে পড়ছে

একের পাতার পর

মহিলার সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্কের কথা গণশক্তি তুলে ধরে বলেছে, এ নিয়ে পারিবারিক অশান্তির ফলেই নাকি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আত্মহত্যা করেছেন। এর সঙ্গে আলু চাষের ক্ষতি বা ঋণের বোঝার কোন সম্পর্ক নেই।

মিথ্যা কলঙ্কলেপনে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথবাবুর স্ত্রী ঝর্ণাদেবী ও পরিবারের লোকজন মেমারি-২ এর বিডিও শিবনাথ মণ্ডলকে যে অভিযোগ জানিয়েছিলেন বিডিও তা স্বীকার করেছেন। বুধবার (১০-৩-০৪) বর্ধমানে এক বৈঠকে যোগ দিতে এসে তিনি বলেন — ‘রবীন্দ্রবাবুর স্ত্রী ও তাঁর পরিবারের লোকেরা আমাকে বলেন, তাঁদের পরিবারের মানসম্মান নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। মৃতের নামে নোংরা প্রচার বন্ধ করার জন্যও তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেন।’ (আনন্দবাজার ১১-৩-০৪)

মা-বাবা সহ ১১ জনের পরিবারের কর্তা হিসাবে রবীন্দ্রনাথবাবু সংসারের হাল ধরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথবাবুর বৃদ্ধ বাবা হরকুমার ঘোষ বলেন, ‘বেশ কিছু টাকা ধার করে নিজের সাত বিঘা জমি ছাড়াও আরও কয়েক বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছিল আমার ছেলে। কিন্তু ধসা রোগের আক্রমণে জমির সব আলু নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল ও। সেইজন্যই এই কাণ্ড। মৃত চাষীর ভাই স্বপনবাবু বলেন — ‘বড় আশা করে দাদা আলুচাষ করেছিলেন। বাজারদর ভাল ছিল। আশা ছিল, আলু বেচে আগের ধারের অনেকটা সামলে নেবেন। বাধ সাধল ধসা রোগ।’

‘গত বছর লাভের আশায় তিন হাজার প্যাকেট আলু রেখেছিলেন হিমঘরে, প্রতি প্যাকেট হিমঘরে রাখতে খরচ হয় ১৫০ টাকা। শেষ পর্যন্ত বাজারদর না থাকায় প্রতি প্যাকেট আলু মাত্র ৪০ টাকায় বিক্রি করতে হয়েছিল তাঁকে। তবু হাল ছাড়েননি। অনেকটা জমিতে তারপরেই বোরো চাষ করেছিলেন। ওই চাষে কেবল জলই কিনতে হয়েছিল বিঘা পিছু ৬৫০ টাকা হিসাবে। তাতে গত বছর প্রায় ৭০-৮০ হাজার টাকা ধার হয়। বোরো ধানের স্বাভাবিক ফলন হয় যেখানে বিঘাতে ২২ মণ, সেখানে ১১-১২ মণের বেশি হয়নি। সেই ধানও নামমাত্র দামে বিক্রি করেন তিনি। ধানের দর আদৌ ওঠেনি সেবার। এবার নিজের জমি ছাড়াও অন্যের জমিতে আলু চাষ করে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন রবীন্দ্রনাথবাবু। কিন্তু বাধ সাধল ধসা রোগ’ (আনন্দবাজার ৬-৩-০৪)

স্থানীয় জোৎরামের আলুচাষী বুদ্ধদেব ঘোষের দেওয়া হিসাব অনুসারে, আলুতে বিঘা পিছু খরচ ৭-৮ হাজার টাকা। মেমারির মতো এলাকায় বিঘা পিছু উৎপাদন হওয়ার কথা ৯০-১০০ মণ। কিন্তু ধসারোগের প্রকোপে বিঘেতে আলু হচ্ছে ৪০ মণ। ফলে বিঘায় লোকসান ৫০০০ টাকা। তার চেয়েও বড় কথা, ধসা রোগ হওয়া আলু হিমঘরও রাখতে চায় না।

বীজ, সার, কীটনাশকের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সারের উপর ভরতুকি তুলে নিচ্ছে, কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যুতের দাম বিপুল হারে বাড়ানো হচ্ছে, সেচকরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, জমির খাজনা, সেসও কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে। যার ফলে উৎপাদন খরচ বেড়েছে বিপুল পরিমাণে, কিন্তু বাড়েনি ফসলের দাম, যা চাষীদের জীবনে নামিয়ে এনেছে বিপর্যয়। পশ্চিমবাংলার কৃষক দরদী(!) সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের কৃষক দরদের নমুনা বুঝতে খুব বেশি গবেষণার প্রয়োজন নেই, আলু চাষী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের আত্মহত্যার ঘটনা নগ্ন করে দিল রাজ্য সরকার এবং সি পি এম দলের চরিত্র।

রাজ্য সরকারের নানা প্রশাসনিক দপ্তর ও কৃষি দপ্তরের আমলাদের পুষতে যেখানে জনগণের দেওয়া ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে এই দপ্তরগুলির ভূমিকা কী? আলু চাষ ও আলুচাষীদের বিপর্যস্ত অবস্থার খোঁজ কতটা রাখে এই দপ্তর? এই আত্মহত্যার খবরে বর্ধমান জেলা কৃষি আধিকারিক অশ্বিনীকুমার বারি বলেছিলেন, ‘ওখানে কেন, জেলার কোথাও ধসা রোগের আক্রমণ মারাত্মক আকার নেয়নি।’ অন্যদিকে মহকুমা কৃষি আধিকারিক অনন্ত হাজরা বলেন, ‘এই ধসা রোগে আলুর ফলন যে ৫০ ভাগ কমে যেতে পারে, তা আমরা জেলা তথা রাজ্য কৃষি আধিকারিককে জানিয়েছিলাম। (আনন্দবাজার ১০-৩-০৪)। এই আত্মহত্যার ঘটনায় হৈ চৈ হতে রাজ্য কৃষিদপ্তর এবং রাজ্য সরকারের টনক নড়েছে। এখন তারা নাকি খোঁজখবর, তদন্ত এসব করার উদ্যোগ নিচ্ছে। এই প্রশাসননির্ভর সরকারের মন্ত্রীদের কানে এই বিপর্যয়ের জল ঢোকা কি এতই সহজ? যারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের কানে জনগণের কান্না কখনো পৌঁছায় না। যদিও বা পৌঁছায়, এ কান্না তাদের ব্যাকুল করে না, করে বিরক্ত। নাহলে মুখ্যমন্ত্রী এমন কথা বলেন কী করে!

রবীন্দ্রনাথ ঘোষের ঋণ যে ২ লক্ষ টাকার বেশি হয়েছিল এও বাস্তব। বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, সি পি এম নেতা চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মৃত চাষীর পরিবার — মেমারির একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে বিপুল টাকা ঋণ নিয়ে মিনি ট্রাক্টর কিনেছিল। গত বছর ৭ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথবাবু বিজুর ইউনিয়ন সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতি থেকে ২২ হাজার টাকা ঋণ নেন। সে ঋণ শোধ হয়নি। বিজুর ঋণদান সমিতি ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ঋণ শোধ করার নোটিশ দিয়েছে ৩১ মার্চের মধ্যে। সেই নোটিশ সংবাদিকদের দেখান মৃতের বাবা। ১৯৯৮ সালে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ৭৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিল তাদের পরিবার, সে টাকা সব শোধ না হওয়ায় তারও নোটিশ এসেছে এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঐ নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঋণ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথবাবু মহাজনদের কাছ থেকেও চড়া সুদে বহু টাকা ঋণ করেছিলেন বলে স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, যার ফলে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

কথা হচ্ছে, এই নির্মম সত্যকে অস্বীকার করে সি পি এম ও রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে চূড়ান্ত মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে কেন? এর কারণ সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘ ২৬ বছরের শাসনে রাজ্যের উন্নতির যে রঙিন বেলুন ফুলিয়ে তারা নানা বক্তৃতায়, বিজ্ঞাপনে, প্রচারে তুলে ধরছে, এই লোকসভা নির্বাচনের মুহূর্তে সে বেলুন ফেঁসে গেলে নির্বাচনে তার ছাপ পড়বে। তাই অতীতে নানা বিপর্যয় চাপতে যেমন ‘গোয়েবল্‌সীয়’ পদ্ধতিতে মিথ্যা প্রচারের ঝড় তুলে সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, এ ক্ষেত্রেও তাই করছে। কিন্তু এত কিছু করেও সত্যকে চাপা দেওয়া যাচ্ছে না। তাই তারা রবীন্দ্রনাথবাবুর পরিবারকে কিছু আর্থিক সাহায্য ও সুযোগ সুবিধা দিয়ে চুপ করানোর চেষ্টা করছে এবং অপরদিকে এলাকার মানুষ ও মৃতের পরিবারের লোকেদের ভয়ভীতি দেখিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে নিষেধ করছে। বিসকোপার গদাধর প্রামাণিক, বেগুনিয়ার স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়দের কথায় প্রকাশ পায়, ঋণের বোঝা বইতে না পারায় রবীন্দ্রনাথবাবু আত্মহত্যা করেছেন কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে তাঁদের চাপ দিয়ে বলতে বাধ্য করা হচ্ছে, ‘অবৈধ সম্পর্কের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে।’ (আনন্দবাজার ১০-৩-০৪)

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, উদার অর্থনীতি ও বেসরকারীকরণের নীতি দেশে যত বিস্তার লাভ করছে, ততই কৃষিতে ভরতুকি তুলে দেওয়া হচ্ছে। কৃষিপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে অবাধে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে যতই দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে ততই ক্ষুদ্র, নিম্ন ও মধ্যচাষীদের জীবনে সঙ্কট তীব্রতর হচ্ছে। কৃষিপণ্যের বাজারও একচেটিয়া পুঁজির নিয়ন্ত্রণে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি কৃষিপণ্যের বড় ব্যবসায়ীদের ভরতুকি দিচ্ছে, ফুড প্রসেসিং শিল্পগুলিকে অনুদান সহ নানা সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। কিন্তু কৃষকদের সেচের জল, বিদ্যুৎ, বীজ, সার, কীটনাশকের বিপুল মূল্যবৃদ্ধি করছে। জমি এবং উৎপন্ন ফসলের উপর নানা রকমের কর বাড়িয়ে চলেছে। কৃষিপণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের কার্যত কোন ভূমিকা নেই, নিয়ন্ত্রণও নেই। বৃহৎ ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিরাই কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। ফসল ওঠার সময় কৃষিপণ্যের দাম কমিয়ে দিয়ে সস্তা দরে কৃষিপণ্য কিনে মজুত করে নেয় বৃহৎ ব্যবসায়ীরা। ফলে ফসল বিক্রি করে চাষের খরচটুকুও পায় না প্রকৃত কৃষক। ক্রমাগত ঋণের বোঝার চাপে হতাশায় কৃষকদের আত্মহত্যার সংখ্যা ভয়াবহভাবে বেড়ে চলেছে। গত তিন বছরে রাজস্থানের প্রায় ২ হাজার কৃষক দেনার দায়ে আত্মহত্যা করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে শুধু তিনটি গ্রামে রেস্তাছিলতালা, খাম্ভামপাড়ু এবং মাছেরলায় ১০০ জনেরও বেশি কৃষক নিজের কিডনি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে পরিবারের খিদের জ্বালা মেটাতে। ১৯৯৭-২০০০ এই চার বছরে অন্ধ্রের অনন্তপুর জেলায় ১৮২৬ জন প্রান্তিক চাষী আত্মহত্যা করেছে। সারা অন্ধ্রপ্রদেশে ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করেছে তিন হাজারের বেশি কৃষক। ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত সারা দেশে ২৫ হাজারের বেশি কৃষক আত্মঘাতী হয়েছে। এই তথ্য গণশক্তি পত্রিকাতেও পাওয়া যায়, শুধু পশ্চিমবঙ্গের ঘটনা তুললেই সেটা গণশক্তির ভাষায় অপপ্রচার। এখানে রাজ্য সরকার অনাহার, অপুষ্টি ও ঋণের দায়ে মানুষের মৃত্যুর ঘটনাকে নানা মিথ্যা গল্পের আড়ালে ঢেকে রাখায় প্রকৃত সত্য প্রকাশ পায় না। কেন্দ্রের বিজেপি জোট সরকারের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নীতি, অন্যান্য রাজ্য সরকার এবং এ রাজ্যের সি পি এম- ফ্রন্ট সরকারও কার্যকরী করছে। ফলে কলেকারখানায় কর্মরত শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বিপর্যয়ের মত কৃষকদের জীবনেও বিপর্যয় ভয়াবহ রূপে নেমে এসেছে।

বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব

এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ৮ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নিম্নোক্ত মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাইলে স্পিকার কেবল তাঁকে প্রস্তাব পাঠ করার অনুমতি দেন।

‘‘বর্ধমানে কালনা কাটোয়া ও অন্যান্য এলাকায় মাঠের পর মাঠ জুড়ে ধসা রোগের আক্রমণে বিপর্যস্ত আলু চাষ। হাজার হাজার টাকা খরচ করে চাষ করা এই ‘ক্যাশ ক্রপ’ আলুচাষীদের যে বিপুল ক্ষতির মুখে ঠেলে দিয়েছে তার ফলে আজ তাঁদের ঘরে ঘরে হাহাকার। ক্ষতির বহর এত ভয়াবহ যে চাষীদের আত্মহননের মত মর্মান্তিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এর জ্বলন্ত নজির গত ৩ মার্চ ২০০৪ রাতে মেমারি ২নং ব্লকে বিসকোবা গ্রামের এক চাষী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আলু চাষের এই বিপর্যয়ের কারণে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। এমতাবস্থায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য এবং আলুচাষী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের পরিবারকে উপযুক্ত সাহায্য ও আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছি।’’

মুখ্যমন্ত্রী এই দুঃখজনক ঘটনাকে ‘বাজে ব্যাপার’ বলে মন্তব্য করেছেন। তার নিন্দায় দেবপ্রসাদ সরকার এদিন বিধানসভায় ওয়াক আউট করেন।

দিল্লিতে বিক্ষোভ

জনগণের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি প্রতিকারের দাবিতে দিল্লির উত্তর-পূর্ব জেলা এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে ৩ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

উদিত ভারত

* দেশের ৪৮% মানুষ বাস করেন এমন ঘরে যার পাকা দেওয়াল ও ছাদ নেই।
* ৬০% মানুষের বাসস্থানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই।
* ৪৪% মানুষের বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই
* নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ৩৪ কোটি
* ১৫ কোটি শিশু স্কুলে যায় না
* ৩ - ৬ বছর বয়সের ৪৫.৫% শিশু অপুষ্টিতে ভোগে।

(Census Report, Govt. of India, 2001)

* গড় ভারতীয় পরিবার পাঁচ বছর আগের তুলনায় বছরে ১০০ কেজি খাদ্য কম গ্রহণ করে। ৭০% মানুষ আগের তুলনায় কম ক্যালরি গ্রহণ করছে। (জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্ট)
* কর্পোরেট ইন্ডিয়া চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ৬ মাসে মুনাফায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে। প্রায় আড়াই হাজার কোম্পানি মুনাফা বাড়িয়েছে ৩৯ শতাংশ।

(Economic Times, 1.1.2004)

এদেশে —

* দৈনিক ৪৫ টাকার কম আয়ের জনসংখ্যা ৩৪.৭%
* দৈনিক ৯০ টাকার কম আয়ের জনসংখ্যা ৭৯.৯%
* ঘোষিত দারিদ্রসীমার নিচে ২৮.৬%
* পাঁচ বছরের নিচে কম ওজনের শিশু ৪৭%

(UNO, Human Dev. Index, 2003)

নারীর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত

শুধুমাত্র ২০০০ সালেই ভারতবর্ষে ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৩৭৩ জন নারীর ওপর সংগঠিত হয়েছিল চরম অপরাধ। ১৯৯০ সালে ৬৮ হাজার ৮৬৭ থেকে শুরু করে প্রতি বছরই তা বাড়তে বাড়তে ২০০০ এর এই পরিসংখ্যান। হ্যাঁ, এটি সরকারি পরিসংখ্যানই। সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অরগানাইজেশনের দেওয়া এই পরিসংখ্যানের বাইরে আরও কত অসংখ্য ভয়ঙ্কর ঘটনা এদেশে আছে এবং ঘটছে তা সহজেই বোঝা যায়। এই চিত্র সারা দেশের। বিজেপি, কংগ্রেস সহ পুঁজি-পতিশ্রেণী তোষণকারী ক্ষমতাসীন দলগুলির দ্বারা পরিচালিত সব রাজ্যেই একই ভয়ঙ্কর ছবি। বাদ নেই এমনকি সি পি এম শাসিত পশ্চিমবঙ্গও।

এই অত্যাচারিতারা কারা? কারুর মা, কারুর বোন, কারুর স্ত্রী, কারুর সন্তান — এদের মধ্যে অনেকেই বালিকা, এমনকী ৬ মাসের শিশুও। এই অত্যাচারিতাদের কেউ ধর্ষিতা, কেউ গণধর্ষিতা, কেউ খুন হয়েছেন, কেউ আত্মহত্যা করে বাঁচতে চাওয়ার দলে, কেউ বা চিরতরে অন্ধকার জীবনে হারিয়ে যাওয়া মানবপরিচয়হীন সত্ত্বা।

সভ্য মানুষ শুনলে শিউরে উঠবেন — ১৯৯৯ এবং ২০০০, এই দুই বছরে ভারতে পঞ্চাশোর্ধ মহিলাদের ওপর ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় তিনগুণ। নারীর প্রতি সমাজের মর্যাদাবোধের স্বরূপ এই একটি তথ্যেই নগ্নভাবে স্পষ্ট।

কন্যাভ্রূণ হত্যা আজ কী ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে তা আমরা জানি। একটি পরিসংখ্যানেই তা স্পষ্ট। ১৯০১-এ প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা যেখানে ছিল ৯৭২, ২০০১-এ তা দাঁড়িয়েছে ৯৩৩।

বিজেপি, কংগ্রেস সহ সমস্ত শাসকদল আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নানা রঙিন প্রচারের মাধ্যমে নারীসমাজের জয়গান গাইছে। অথচ বাস্তব পরিস্থিতি কঠিন, রূঢ়। আসলে পচাগলা সংস্কৃতির ধারক এই বুর্জোয়া দলগুলির চোখে নারী মানুষ নয়, ভোগের বস্তু। তাইতো কাগজ, টিভি, সিনেমা, বিজ্ঞাপন, শিল্প, সাহিত্যের মাধ্যমে এই ন্যক্কারজনক মনোভাবই সমাজে তৈরি করছে সভ্যতার চরম শত্রুরা, পুঁজিপতিশ্রেণীর এই দলগুলি।

সর্বভারতীয় চাকরি-চিত্র

* দেশের কর্মরত জনসংখ্যার ৯৩ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমশক্তি বেচে জীবন-ধারণ করে। দেশে মোট কর্মরত মানুষের মাত্র ৭ শতাংশ রয়েছে সংগঠিত ক্ষেত্রে।
* সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরি হ্রাস পেয়েছে শিল্পসংস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়া ও কর্মচারীদের হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে বিদায় দেওয়ার (VRS) জন্য। ২০০০-০১ ও ২০০১-০২ এই দুই বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি ভি আর এস-এর মাধ্যমে ১ লক্ষ কর্মচারীর চাকরি খতম করে দিয়েছে।
* ২০০১ সালের ৩১ মার্চ সংগঠিত ক্ষেত্রে ছোট বড় সকল রকমের শিল্পসংস্থার মোট সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৮৭ লক্ষ। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ছিল ১ কোটি ৭২ লক্ষ। বেসরকারি মালিকানা সংস্থা ছিল ১ কোটি ১৫ লক্ষ।
* ২০০১ সালের মার্চের শেষে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে মোট শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৯১ লক্ষ। বেসরকারি ক্ষেত্রে ৮৬ লক্ষ ৫০ হাজার। মোট ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৫০ হাজার।
* ২০০২ সালের মার্চ মাসে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২ কোটি ৭৩ লক্ষ ৩২ হাজারে। অর্থাৎ ১ বছরেই ৪ লক্ষেরও বেশি চাকরি চলে যায়।
* এই সময়ে রাজ্যগুলি ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে মহিলা চাকুরিজীবীর সংখ্যা ৩৫ হাজার কমে যায়। (কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ্ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং-এর সমীক্ষা রিপোর্ট, ডেকান হেরাল্ড, ১৬-৫-০৩)

কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই প্রচার করছে — আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রচুর সংখ্যায় চাকরির সুযোগ হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ২০০৩ সালে এই ক্ষেত্রে চাকরি হয়েছিল ৭৫ হাজার। ২০০৪ সালে সম্ভাব্য চাকরির সংখ্যাও বলা হয়েছে বড়জোর ১ লক্ষ। তাছাড়াও মনে রাখতে হবে, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে হলেও যে ধরনের প্রশিক্ষণ দরকার, বিপুল ব্যয়বহুল সেই শিক্ষা কেবল ধনী ঘরের ছেলেমেয়েরাই পেতে পারে। (সূত্র ঃ আউটলুক, ২-২-০৪)

বড়ই সুখে আছে গরিব মানুষ!

* রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার খাদ্য নিরাপত্তা রিপোর্ট ২০০৩ অনুযায়ী ভারতে লাগাতার অভুক্ত/অর্ধভুক্ত মানুষের সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে। ১৯৯৫-৯৭ সালে ছিল ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ। ১৯৯৯-২০০১ সালে হয়েছে ২১ কোটি ৪৫ লক্ষ।
* জাতীয় নমুনা সমীক্ষার সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গ্রামাঞ্চলে প্রতি ২০০ পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার অনাহারে কাটায়। শহরাঞ্চলে সংখ্যাটা প্রতি এক হাজার পরিবারে একটি পরিবার।

তবুও

* রেশনে দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষের জন্য গমের দাম কিলোপ্রতি ২.৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪.৫০ টাকা। চালের ক্ষেত্রে করা হয়েছে ৩.৫০ টাকা থেকে ৫.৯০ টাকা।
* ১৯৯১ সালে রেশনের মাধ্যমে বন্টিত হত ২ কোটি ৮০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য। ২০০০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১ কোটি ৯ লক্ষ টনে।

অথচ সরকারি গুদামে তখন মজুত ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে (উপরে) নাগপুরে মহিলাদের বিক্ষোভ মিছিল। (নিচে) কেরালার ত্রিবান্দ্রমে সমাবেশ

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net